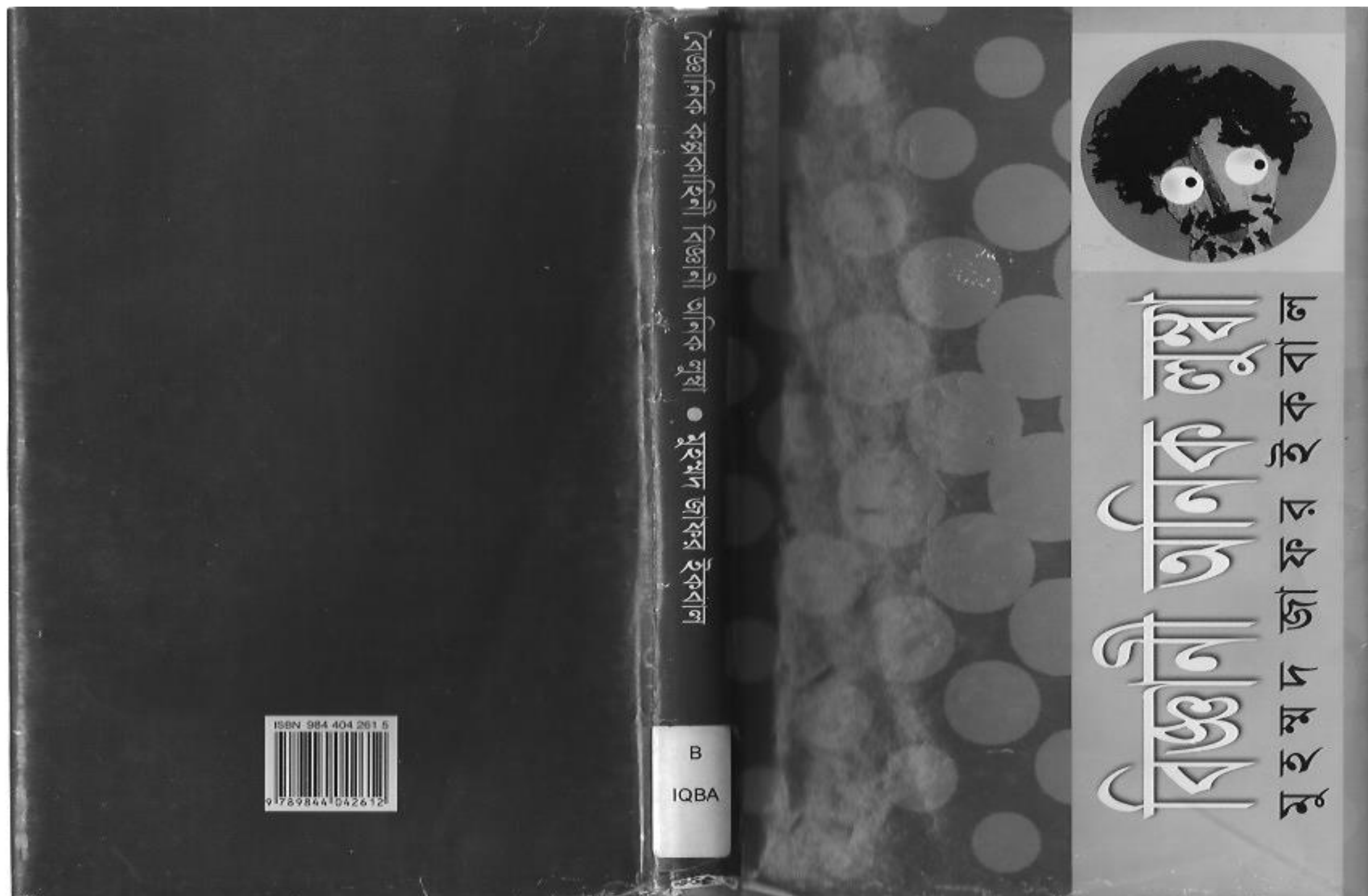


বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ISBN 984 404 261 5
9789844042612
B
IQBA

প্রকাশনার ২৭ বছর


প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৯০·০০ টাকা

ISBN 984-404-261-5

BIGYANI ANIK LUMBA (A Science Fiction) by Muhammed Zafar Iqbal
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100
email : anupam05@aitlbd.net

Price : Tk. 90.00 US$ 7.00 only

pathfinder

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- রাজু ও আগুনালির ভূত
- বাচ্চা ভয়ংকর কাচ্চা ভয়ংকর
- নিতু আর তার বন্ধুরা
- মেকু কাহিনী
- কাজলের দিনরাত্রি
- গণিত এবং আরো গণিত
- মধ্যরাত্রিতে তিনজন দুর্ভাগা তরুণ
- টুকি এবং ঝা'য়ের (প্রায়) দুঃসাহসিক অভিযান



বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা

আমি জানি, বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করবে না যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার নামটা আমার দেয়া। একজন মানুষ, যার বয়স প্রায় আমার বয়সের কাছাকাছি, তাকে হঠাৎ করে একটা নতুন নাম দিয়ে দেয়াটা এত সোজা না। হেজিপেজি মানুষ হলেও একটা কথা ছিল কিন্তু অনিক লুম্বা মোটেও হেজিপেজি মানুষ নয়, সে রীতিমতো একজন বিজ্ঞানী মানুষ, তাই কথা নেই বার্তা নেই সে কেন আমার দেওয়া নাম নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে ? কিন্তু সে তাই করছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, "ভাই আপনার নাম ?" সে তখন সরল মুখ করে বঁলে, "অনিক লুম্বা।" মানুষজন যখন অবাক হয়ে তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায় তখন সে একটু গরম হয়ে বলে "এত অবাক হচ্ছেন কেন ? একজন মানুষের নাম কি অনিক লুম্বা হতে পারে না ?" সত্যি কথা বলতে কি একজন বাঙালির এরকম নাম হবার কথা না, কিন্তু সেটা কেউ তাকে বলতে সাহস পায় না। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, "পারে পারে, অবশ্যই পারে।" বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা তখন দাঁত বের করে হাসে।

কেমন করে এই নামকরণ হয়েছে সেটা বুঝতে হলে সুব্রতের কথা একটু জানতে হবে। সুব্রত হচ্ছে আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। আমরা একসাথে স্কুলে নিল-ডাউন হয়ে থেকেছি, কানে ধরে উঠবস করেছি এবং বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছি। বড় হবার পর আমার সব বন্ধুবান্ধব বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, যারা পাচার হয়নি তারা চাকরি-বাকরি বা ব্যবসাপাতি করে এত উপরে উঠে গেছে যে আমার সাথে কোন যোগাযোগ নেই। হঠাৎ কোথাও দেখা হলে তারা না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। নিতান্তই সেই সুযোগ না হলে অবাক হবার ভান করে বলে, "আরে! জাফর ইকবাল না ?"

আমি বলি, "হ্যাঁ। আমি জাফর ইকবাল।" সে তখন আপনি-তুমি বাঁচিয়ে বলে, "আরে! কী খবর ? আজকাল কী করা হয় ?"



আমি বিশেষ কিছুই করি না, সেটা বলা শুরু করতেই তারা ইতিউতি তাকাতে থাকে, ঘড়ি দেখতে থাকে আর হঠাৎ করে আমার কথার মাঝখানে বলে ওঠে, "ইয়ে, খুব ব্যস্ত আজকে। সময় করে একদিন অফিসে চলে আসলে কেমন হয়? আড্ডা মারা যাবে তখন! হা হা হা।"

তারপর সুড়ুত করে সরে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই একদিন আমি তাদের অফিসে গিয়ে হাজির হবো, তখন দেখি তারা কী করে, কেমন করে আমার কাছ থেকে পালায়! তবে সুব্রত মোটেও এরকম না, তার কথা একেবারে আলাদা। সুব্রতের সাথে আমার পুরোপুরি যোগাযোগ আছে, সত্যি কথা বলতে কি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এতটা যোগাযোগ না থাকলেই মনে হয় ভাল ছিল। প্রায়ই মাঝরাতে ফোন করে ডেকে বলে, "কী হলো? ঘুমাচ্ছিস নাকি?"

একজন মানুষ তো ঘুমাতে ঘুমাতে টেলিফোনে কথা বলতে পারে না, সে জন্যে তো তাকে জেগে উঠতে হবে, তাই আমি বলি, "না, মানে ইয়ে—" সুব্রত তখন বলে, "তোকে কোন বিশ্বাস নেই। সন্ধে হবার আগেই নাক ডাকতে থাকিস। এ দিকে কী হয়েছে জানিস?"

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, "কী?"

সুব্রত গলা নামিয়ে চাপা স্বরে বলে, "একেবারে ফাটাফাটি ব্যাপার!" সে তখন ফাটাফাটি ব্যাপারটার বর্ণনা দেয়, তবে কখনই সেটা সত্যিকার ফাটাফাটি কিছু হয় না। ব্যাপারটা হয় কবিতা পাঠের আসর, বাউল সম্মেলন, মাদার গাছ রক্ষা আন্দোলন কিংবা সবার জন্য জোছনার আলো এই ধরনের কিছু। কোথাও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো হলেই সুব্রত মহাউৎসাহে ত্রাণ কাজে লেগে যায়। তাকে দেখলেই মনে হয় তার বুঝি জন্মই হয়েছে অন্য মানুষের কাজ করার জন্যে। মানুষের সেবা করা খুব ভাল ব্যাপার, কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়— তার ধারণা আমাদের সবারও বুঝি জন্ম হয়েছে তার সাথে সাথে দুনিয়ার সব রকম পাগলামিতে যোগ দেয়ার জন্যে।

রাত্রি বেলা ঘুমাচ্ছি, গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দে টেলিফোন বাজতে থাকে, মাঝরাতে টেলিফোন বাজলেই মনে হয় বুঝি ভয়ংকর কোন একটা দুঃসংবাদ। আমি লাফিয়ে ঘুম থেকে উঠে হাচড়-পাচড় করে কোনমতে দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশে সুব্রতের অমায়িক গলা, "জাফর ইকবাল?"

হঠাৎ করে ঘুম থেকে তুললে আমার ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, আমি অনেকক্ষণ কিছু বুঝতে পারি না। কোনমতে বললাম, "হাঁহ?"

"কাল কী করছিস?"

আমি আবার বললাম, "হাঁহ ?"

সুব্রত নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, "কী আবার করবি ? তুই কোন দিন কাজকর্ম করিস ? বসে বসে খেয়ে খেয়ে তুই কী রকম খাসির মতো মোটা হয়েছিস খেয়াল করেছিস ? সকালবেলা চলে আয়। ওসমানী মিলনায়তনে। সকাল ন'টা শার্প।"

আমি বললাম, "হাঁহ ?"

"দেরি করিস না। খুব জরুরি।"

"হাঁহ ?" এতক্ষণে আমার ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে— কে ফোন করেছে, কেন ফোন করেছে, কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করব সুব্রত ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে। আমি আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায় আবার কোনমতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠেছি তখন আবছা আবছা ভাবে মনে পড়ল যে রাতে কেউ একজন ফোন করে কিছু একটা বলেছিল। কিন্তু কে ফোন করেছিল, কেন ফোন করেছিল, ফোন করে কী বলেছিল কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা করতে বসেছি দুই টুকরা রুটি টোস্ট একটা কলা খেয়ে ডাবল ডিমের পোচটা মাত্র মুখে দিয়েছি তখন দরজায় প্রচণ্ড শব্দ। খুলে দেখি সুব্রত। আমাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই এখনো রেডি হোস নাই ?"

আমি আমতা করে বললাম, "কীসের জন্যে রেডি ?"

"রাত্রে যে বললাম ?"

"কী বললি ?"

"ওসমানী মিলনায়তনে। সকাল ন'টায়। মনে নাই ?"

"ঘুমের মাঝে কথা বললে আমার কিছু মনে থাকে না।"

সুব্রত অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বলল, "কোন দায়িত্বজ্ঞান নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই, এই জন্যে তোদেরকে দিয়ে কিছু হয় না। ওঠ। এখনি ওঠ। যেতে হবে।"

আমি দুর্বলভাবে বললাম, "মাত্র নাস্তা করতে বসেছিলাম। তুইও আয়। কিছু একটা খা।"

"সব সময় শুধু তোর খাই খাই অভ্যাস।" টেবিলে আমার ডাবল ডিমের পোচ দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, "খাসির মতো মোটা হয়েছিস আর এখনো ডিম খেয়ে যাচ্ছিস ? জানিস না ডিমে কোলেস্টেরল থাকে ? আর খেতে হবে না। ওঠ। তোর শরীরে যে মেদ আর চর্বি আছে এক মাস না খেলেও কিছু হবে না।"

কাজেই আমাকে তখন তখনই উঠতে হলো এবং সুব্রতের সাথে বের হতে হলো। যেতে যেতে সুব্রত বলল যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ওসমানী মিলনায়তনে

পদচারী বিজ্ঞানী সম্মেলনে। পদচারী বিজ্ঞানীটা কী ব্যাপার সেটা জিজ্ঞেস করব কিনা সেটা নিয়ে একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, সুব্রত তখন ধমক দিয়ে বলল, "তুই কোন দুনিয়ায় থাকিস ?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কেন, কী হয়েছে ?"

"পত্রিকায় দেখিসনি, সারা দুনিয়ায় পদচারী বিজ্ঞানীদের নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে ? বিজ্ঞান এখন আর শুধু ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় ল্যাবরেটরিতে থাকবে না। বিজ্ঞান এখন সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে যাবে। গরিব-দুখী মানুষও এখন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবে। চাষী-মজুর গবেষণা করবে। স্কুলের ছাত্র গবেষণা করবে। ঘরের বউ গবেষণা করবে। এর নাম দেয়া হয়েছে বেয়ারফুট সায়েন্টিস্টস মুভমেন্ট। আমরা বাংলা করেছি পদচারী বিজ্ঞানী আন্দোলন। গত সপ্তাহে প্রথম আলোতে বিশাল ফিচার বের হয়েছে, পড়িসনি ?"

পত্রিকায় যেসব খবর বের হয় সেগুলো দেখলেই মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বলে আমি যে বহুদিন হলো খবরের কাগজ পড়াই ছেড়ে দিয়েছি সেটা বলে আর নতুন করে সুব্রতের গালমন্দ খেলাম না। বললাম, "নাহ! খেয়াল করিনি।"

"তুই কোন জিনিসটা খেয়াল করিস ?" সুব্রত রেগেমেগে বলল, "তুই যে দুই পায়ে দুই রঙের মোজা পরে আছিস সেটা খেয়াল করেছিস ?"

মানুষকে কেন দুই পায়ে এক রঙের মোজা পরতে হবে সেটা আমি কখনোই বুঝতে পারিনি। দুই পায়ে এক রকম মোজা পরতে হবে আমি সেটা মানতেও রাজী না। তাই মোজা পরার সময় হাতের কাছে যেটা পাই সেটাই পরে ফেলি। কিন্তু সুব্রতের কাছে সেটা স্বীকার করলাম না। পাগুলো সরিয়ে নিতে নিতে অবাক হবার ভান করে বললাম, "আরে তাই তো! এক পায়ে বেগুনি অন্য পায়ে হলুদ! কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই তাড়াহুড়া করে পরে ফেলেছি।"

"অসম্ভব!" সুব্রত বলল, "তুই নিশ্চয়ই কালার ব্লাইন্ড। কোন সুস্থ মানুষ দুই পায়ে এরকম ক্যাটক্যাটে রঙের দুটো মোজা পরতে পারে না। ভুল করেও পরতে পারে না।"

আমি আলাপটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে বললাম, "তা, তুই পদচারী বিজ্ঞানী নিয়ে কী যেন বলছিলি ?"

"হ্যাঁ, এরা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের বিজ্ঞানী। এরা কেউ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর না। এরা কেউ পিএইচডি না, এরা কেউ বড় বড় ল্যাবরেটরিতে কাজ করে না। এদের কেউ থাকে গ্রামে কেউ শহরে। কেউ পুরুষ, কেউ মহিলা। কেউ ছোট, কেউ বড়। কেউ চাষী, কেউ মজুর। এরা নিজেদের মতো বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে। এদের আবিষ্কার হচ্ছে জীবনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে আবিষ্কার, প্রয়োজনের আবিষ্কার..."

সুব্রত কথা বলতে পছন্দ করে, একবার লেকচার দিতে শুরু করলে আর থামতে পারে না, একেবারে টানা কথা বলে যেতে লাগল। একবার নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু দম নিতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কী করব ?"

সুব্রত অবাক হয়ে বলল, "কী করবি মানে ? সাহায্য করবি।"

"সাহায্য করব ? আমি ?" এবারে আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমি বিজ্ঞানের 'ব'ও জানি না।"

"তোকে বিজ্ঞানের কাজ করতে হবে কে বলেছে ? তুই ভলান্টিয়ারের কাজ করবি। কনভেনশনটা যেন ঠিকমতো হয় সেই কাজে সাহায্য করবি।"

আমি ঢোঁক গিলে চোখ কপালে তুলে বললাম, "ভলান্টিয়ারের কাজ করব ? আমি ?"

"কেন, অসুবিধে কী আছে ?" সুব্রত চোখ পাকিয়ে বলল, "সব সময় স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কাজ করবি ? অন্যের জন্যে কিছু করবি না ?"

সুব্রতের সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই বলে আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে রইলাম।

তবে আমি যে শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের জন্যে কাজ করি অন্যের জন্যে কিছু করি না, সেটা সত্যি না। আমার বড় বোনের ছোট মেয়ের বিয়ের সময় আমি গেস্টদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। খাবার পরিবেশন করার সময় টগবগে গরম খাসির রেজালার বাটিটা একজন মেজর জেনারেলের কোলে পড়ে গেল। সাথে সাথে সেই মেজর জেনারেলের সে কী গগনবিদারী চিৎকার! ভাগ্যিস অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তা না হলে আমার অবস্থা কী হতো কে জানে! আরেকবার পাড়ার ছেলেপিলেরা রবীন্দ্রজয়ন্তী করছে, আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে স্টেজে পর্দা টানানোর জন্যে। প্রধান অতিথি বক্তৃতা শেষ করেছে, আমার তখন পর্দা টানার কথা, আস্তে আস্তে পর্দা টানছি হঠাৎ করে পর্দা কোথায় জানি আটকে গেল। পর্দা খোলার জন্যে যেই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েছি সাথে সাথে বাঁশসহ পর্দা হুড়মুড় করে প্রধান অতিথির ঘাড়ে! চিৎকার হৈচৈ চেঁচামেচি সব মিলিয়ে এক হুলস্থূল কাণ্ড। এইসব কারণে আমি আসলে অন্যকে সাহায্য করতে যাই না। তারপরেও মাঝে মাঝে সাহায্য না করে পারি না। একদিন শাহবাগের কাছে হেঁটে যাচ্ছি, দেখি রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধা মহিলা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, অসংখ্য বাস-ট্রাক-গাড়ির ভেতর রাস্তা পার হবার সাহস পাচ্ছেন না। আমি তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলাম। রাস্তা পার করার সময় দুর্বলভাবে কী একটা বলার চেষ্টা করলেন আমি ঠিক শুনতে পাইনি। কিন্তু রাস্তার অন্য

পাশে এসে ভদ্র মহিলার সে কী চিৎকার। বৃদ্ধা মহিলা নাকি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, মোটেও রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিলেন না!

এরকম নানা ধরনের অভিজ্ঞতার কারণে আমি আজকাল মোটেও অন্যের জন্যে কাজ করতে চাই না। নিজের জন্যে কাজ করে নিজেকে বিপদে ফেলে দিলে কেউ তার খবর পায় না। কিন্তু অন্যের জন্য কাজ করে তাকে মহাগড্ডার মাঝে ফেলে দিলে তারা তো আমাকে ছেড়ে দেবে না। সুব্রতের সাথে সেটা নিয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই, সে আবার আরেকটা বিশাল লেকচার শুরু করে দেবে। আমি কিছু না বলে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে রইলাম।

ওসমানী মিলনায়তনে এসে দেখি হুলস্থূল অবস্থা। হাজার হাজার মানুষ গিজগিজ করছে। হলের ভেতরে সারি সারি টেবিল, সেই টেবিলে নানা রকম বিচিত্র জিনিস সাজানো। পচা গোবর থেকে শুরু করে জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্র, কী নেই সেখানে! হলে পৌঁছেই সুব্রত আমাকে ফেলে রেখে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। আমি একা একা কী করব বুঝতে না পেরে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। সুব্রত একটু চোখের আড়াল হলে সটকে পড়ার একটা চিন্তা যে মাথায় খেলেনি তা নয়, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সুব্রত এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে হঠাৎ আমার কাছে দৌড়ে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বলল, "তুই লাট সাহেবের মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছিস মানে ?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "কী করব আমি ?"

"কী করবি সেটা আমাকে বলে দিতে হবে ? দেখছিস না কত কাজ ? এই পাশে রেজিস্ট্রেশন, ওই পাশে এক্সিবিট সাজানো, ওই দিকে পাবলিক ম্যানেজমেন্ট, ডান দিকে সেমিনার রুম, মাঝখানে ইনফরমেশন ডেস্ক, সব জায়গায় ভলান্টিয়ার দরকার। কোন এক জায়গায় লেগে যা।" আমি আমতা আমতা করে বললাম, "আ-আমি লাগতে পারব না। আমাকে কোথাও লাগিয়ে দে, কী করতে হবে বলে দে।"

সুব্রত বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে দিয়ে দুনিয়ায় কোন কাজ হয় না। আয় আমার সাথে।"

আমি সুব্রতের পিছু পিছু গেলাম, সে রেজিস্ট্রেশন এলাকায় একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, "নে, পদচারী বিজ্ঞানীদের রেজিস্ট্রেশনে সাহায্য কর।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "সেটা কীভাবে করতে হয় ?"

সুব্রত ধমক দিয়ে বলল, "সবকিছু বলে দিতে হবে নাকি ? আশপাশে যারা আছে তাদের কাছ থেকে বুঝে নে।"

সুব্রত তার কাগজের বান্ডিল নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গি করে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় জানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আমার দুই পাশে তাকালাম, বাম দিকে বসেছে হাসি-খুশি একজন মহিলা। ডান দিকে গোমড়ামুখো একজন মানুষ। কী করতে হবে সেটা হাসি-খুশি মহিলাকে জিজ্ঞেস করতেই আমার দিকে চোখ পাকিয়ে একটা ধমক দিয়ে বসলেন। তখন গোমড়ামুখো মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলাম মানুষটা গোমড়ামুখেই কী করতে হবে বুঝিয়ে দিল। কাজটা খুব কঠিন নয়, টাকা জমা দেয়ার রশিদ নিয়ে পদচারী বিজ্ঞানীরা আসবেন, রেজিস্টার খাতায় তাদের নাম লিখতে হবে, তারপর ব্যাজে তাদের নাম লিখে ব্যাজটা তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে। পানির মতো সোজা কাজ।

একজন একজন করে বিজ্ঞানীরা আসতে থাকে, আমি রেজিস্টার খাতায় তাদের নাম তুলে, ব্যাজে নাম লিখে তাদের হাতে ধরিয়ে দেই, তারা সেই ব্যাজ বুকে লাগিয়ে চলে যেতে থাকেন। বানানের জ্ঞান আমার খুব ভাল না, যার নাম গোলাম আলী তাকে লিখলাম গুলাম আলী, যার নাম রইস উদ্দিন তাকে লিখলাম রাইচ উদ্দিন, যার নাম খোদেজা বেগম তাকে লিখলাম কুদিজা বেগম— কিন্তু পদচারী বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। মনে হয় বেশিরভাগই লেখাপড়া জানে না, আর যারা জানে তারা নামের বানানের মতো ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কাজ করতে করতে আমার ভেতরে মোটামুটি একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে, এরকম সময় লম্বা এবং হালকা-পাতলা একজন মানুষ টাকার রশিদ নিয়ে আমার সামনে রেজিস্ট্রেশন করতে দাঁড়াল। আমি রশিদটা নিয়ে জিজ্ঞাস করলাম, "আপনার নাম?"

মানুষটার নাকের নিচে বড় বড় গোঁফ, চুল এলোমেলো এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দুই হাতে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে মানুষটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কী নাম?"

মানুষটা এবারে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেমন যেন কাচুমাচু হয়ে বলল, "আসলে বলছিলাম কী, আমার নাম অনিক লুম্বা।"

আমি একটু অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকালাম। অনিক লুম্বা আবার কীরকম নাম? মানুষটাকে দেখে তো বাঙালিই মনে হয়, কথাও বলল বাংলায়। তাহলে এরকম অদ্ভুত নাম কেন? অনিক হতে পারে। কিন্তু লুম্বা? সেটা কী রকম নাম? আমি অবশ্যি মানুষটাকে তার নাম নিয়ে ঘাঁটালাম না, অন্যের নাম নিয়ে আমি তো আর খ্যাচম্যাচ করতে পারি না। নামটা রেজিস্টার খাতায় তুলে ঝটপট ব্যাজে নাম লিখে তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম ঠিক কী কারণে না মানুষটা ব্যাজটা হাতে নিয়ে কেমন যেন হতচকিতের মতো আমার

দিকে তাকালো। মনে হলো কিছু একটা বলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলল না। কেমন যেন মুচকি হাসল তারপর ব্যাজটা বুকে লাগিয়ে হেঁটে হেঁটে ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার বাম পাশে বসে থাকা হাসি-খুশি মহিলা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, "কী নাম লিখেছেন?"

আমি বললাম, "অনিক লুম্বা।"

"এরকম বিদঘুটে একটা জিনিস কেন লিখলেন?"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "যে নাম বলেছে সে নাম লিখব না?"

হাসি-খুশি মহিলা রাগ-রাগ মুখে বললেন, "ভদ্রলোক মোটেও তার নাম অনিক লুম্বা বলে নাই।"

"তাহলে নাম কী বলেছে?"

"আপনি তাকে নাম বলার সুযোগ পর্যন্ত দেন নাই। তার নামটা একটু লাম্বা। তাই আপনাকে বলেছেন, "আমার নাম অনেক লম্বা" আর সাথে সাথে আপনি লিখে ফেললেন অনিক লুম্বা। অনিক লুম্বা কখনো কারও নাম হয়? শুনেছেন কখনো?"

আমি একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম, আমতা আমতা করে বললাম, "কিন্তু ভদ্রলোক তো আপত্তি করলেন না। ব্যাজটা নিয়ে বেশ খুশি হয়ে চলে গেলেন।"

হাসি-খুশি মহিলা সরু চোখ করে বললেন, "ভদ্রলোক আপনাকে দেখেই বুঝেছেন আপত্তি করে কোন লাভ নেই। যেই মানুষ বলার আগেই নাম লিখে ফেলে তার সাথে কথা বাড়িয়ে বিপদে পড়বে নাকি?"

আমি থতমত খেয়ে গলা বাড়িয়ে 'অনিক লুম্বা'কে খুঁজলাম কিন্তু সেই মানুষটা তখন ভিড়ের মাঝে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে।

সামনে পদচারী বিজ্ঞানীদের অনেক লম্বা লাইন হয়ে গেছে, তাই আবার কাজ শুরু করতে হলো, কিন্তু একটা মানুষের ব্যাজে এরকম একটা বিদঘুটে নাম লিখে দিয়েছি বলে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। আমার পাশে বসে থাকা হাসি-খুশি মহিলা সবার সাথে হাসি মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও একটু পরে পরে আমার দিকে তাকিয়ে বিষ দৃষ্টিতে মুখ ঝামটা দিতে লাগলেন। আমি কী করব বুঝতে না পেরে একটু পরে পরে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাজ করে যেতে লাগলাম।

রেজিস্ট্রেশনের কাজ শেষ হবার পর আমি বিজ্ঞানী 'অনিক লুম্বা'কে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। হলঘরে ছোট ছোট অনেক টেবিল বসানো হয়েছে, সেই

টেবিলগুলোর ওপর পদচারী বিজ্ঞানীদের নানারকম গবেষণা সাজানো। গোবর নিয়ে নিশ্চয়ই অনেকগুলো আবিষ্কার রয়েছে কারণ হলঘরের ভেতরে কেমন জানি গোবর গোবর গন্ধ। টেবিলে নানারকম গাছপালা, গাছের চারা এবং অর্কিড সাজানো। অদ্ভুত ধরনের কিছু ছেনি এবং হাতুড়িও আছে। বোতলে বিচিত্র ধরনের মাছ, কিছু হাঁড়ি-পাতিল এবং চুলাও টেবিলে সাজানো রয়েছে। অল্প কিছু টেবিলে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক সার্কিট সাজানো। এরকম একটা টেবিলে গিয়ে আমি অনিক লুম্বাকে পেয়ে গেলাম। তাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় এবং সে খুব উৎসাহ নিয়ে জটিল একটা যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। বোঝানো শেষ হলেও কয়েকজন মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, একজন একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "ভাই আপনি কোন দেশী ?"

"কেন ? বাংলাদেশী।"

"তাহলে আপনার নামটা এরকম কেন ?"

"কী রকম ?"

"এই যে অনিক লুম্বা। অনিক ঠিক আছে। কিন্তু লুম্বা আবার কী রকম নাম?" অনিক লুম্বা দাঁত বের করে হেসে বলল, "লুম্বা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস নাম। আরেকটু হলে এটা লুমুম্বা হয়ে যেত। প্যাট্রিস লুমুম্বার নাম শুনেন নাই ?" মানুষটি কী বলবে বুঝতে না পেরে একটু দেঁতো হাসি হেসে চলে গেল। যখন ভিড় একটু পাতলা হয়েছে তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "এই যে ভাই। দেখেন, আমি খুবই দুঃখিত।"

"কেন ? আপনি কেন দুঃখিত ?"

"আমি রেজিস্ট্রেশনে ছিলাম। আপনার নাম কী সেটা না শুনেই ভুল করে অনিক লুম্বা লিখে দিয়েছি!"

মানুষটা এবারে আমাকে চিনতে পারল এবং সাথে সাথে হা হা করে হাসতে শুরু করল। আমার লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে যাবার অবস্থা হলো, কোন মতে বললাম, "আমাকে লজ্জা দেবেন না, প্লিজ। আপনার ব্যাজটা দেন আমি ঠিক করে দিই।"

মানুষটা গোঁফ নাচিয়ে বলল, "কেন ? অনিক লুম্বা নামটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না ?"

আমি বললাম, "আসলে তো এটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার না। এটা শুদ্ধ-অশুদ্ধের ব্যাপার। আপনার নামটা না শুনেই আজগুবি কী একটা লিখে দিলাম। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা!"

"কে বলেছে আজগুবি নাম ?" মানুষটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "অনিক লুম্বা খুব সুন্দর নাম। এর মাঝে কেমন জানি বিপ্লবী বিপ্লবী ভাব আছে।"

আমি দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বললাম, "কেন আমার সাথে ঠাট্টা করছেন ?"

মানুষটা চোখ-মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। এই নামটা আসলেই আমার পছন্দ হয়েছে। আমি এটাই রাখব।"

"এটাই রাখবেন ?"

"হ্যাঁ। কনভেনশন শেষ হবার পরও আমার এই নাম থাকবে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আর আপনার আসল নাম ? সার্টিফিকেটের নাম ?"

"সার্টিফিকেটের নাম থাকুক সার্টিফিকেটে।" মানুষটা মুখ শক্ত করে বলল, "আমি সার্টিফিকেটের খেতা পুড়ি।"

আমি বললাম, "কিন্তু—"

"এর মাঝে কোন কিন্তু ফিন্তু নাই। মানুষটা তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঘ্যাচঘ্যাচ করে চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমার যখন জন্ম হয় তখন আমার দাদা আমার নাম রাখলেন কুতুব আলী। আমার নানা আমার জন্মের খবর পেয়ে টেলিগ্রাম করে আমার নাম পাঠালেন মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন। আমার মায়ের আবার পছন্দ মডার্ন টাইপের নাম, তাই মা নাম রাখলেন নাফছি জাহাঙ্গীর। আমার বাবা ছিলেন খুব সহজ-সরল ভাল মানুষ টাইপের। ভাবলেন কার নামটা রেখে অন্যের মনে কষ্ট দেবেন ? তাই কারো মনে কষ্ট না দিয়ে আমার নাম রেখে দিলেন কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর। সারা জীবন এই বিশাল নাম ঘাড়ে করে বয়ে বয়ে একেবারে টায়ার্ড হয়ে গেছি। আমার এই দুই কিলোমিটার লম্বা নামটা ছিল সত্যিকারের যন্ত্রণা। আজকে আপনি সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। এখন থেকে আমি আর কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর না।"

মানুষটি নিজের বুকে একটা থাবা দিয়ে বলল, "এখন থেকে আমি অনিক লুম্বা।"

আমি খানিকটা বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম ?"

আমি বললাম, "জাফর ইকবাল।"

মানুষটি তখন তার হাত আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল "আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুব খুশি হয়েছি জাফর ইকবাল সাহেব।"

আমি তার সাথে হাত মিলালাম এবং এইভাবে আমার বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার সাথে পরিচয় হলো।



মশা

পদচারী বিজ্ঞানী কনভেনশনে অনিক লুম্বার সাথে পরিচয় হবার পর আমি একদিন তার বাসায় বেড়াতে গেলাম। কেউ যেন মনে না করে আমি খুব মিশুক মানুষ, আর কারো সাথে পরিচয় হলেই মিষ্টির বাক্স নিয়ে তার বাসায় বেড়াতে যাই। আমি কখনই কারো বাসায় বেড়াতে যাই না, কারণ কোথাও গেলে কী নিয়ে কথা বলতে হয় আমি সেটা জানি না। আগে যখন পত্রিকা পড়তাম তখন দেশে-বিদেশে কী হচ্ছে তার হালকা মতোন একটা ধারণা ছিল, পত্রিকা পড়া ছেড়ে দেবার পর এখন কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে একেবারে কোন ধারণা নেই। দেশের সেরা মাস্তান কী গাল কাটা বক্কর নাকি নাক ভাঙ্গা জব্বর, সেটাও আমি আজকাল জানি না। কোন নায়ক ভাল মারপিট করে, কোন নায়িকা সবচেয়ে মোটা, কোন গায়কের গলা সবচেয়ে মিষ্টি, কোন কবির কবিতা ফাটাফাটি, এমনকি কোন মন্ত্রী সবচেয়ে বড় চোর সেটাও আমি জানি না! কাজেই লোকজনের সাথে বসে কথাবার্তা বলতে আমার খুব ঝামেলা হয়। কেউ হাসির কৌতুক বললেও বেশির ভাগ সময়ে সেটা বুঝতে পারি না, যদিবা বুঝতে পারি তাহলে ঠিক কোথায় হাসতে হবে সেটা ধরতে পারি না, ভুল জায়গায় হেসে ফেলি! সে জন্যে আমি মানুষজন এড়িয়ে চলি, তবে অনিক লুম্বার কথা আলাদা। কেন জানি মনে হচ্ছে আমার এই মানুষটার বাসায় যাওয়া দরকার। মানুষটা অন্য দশজন মানুষের মতো না।

বাসা খুঁজে বের করে দরজায় শব্দ করতেই অনিক লুম্বা দরজা খুলে দিল। আমার কথা মনে আছে কিনা, কে জানে, তাই নতুন করে পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম। অনিক লুম্বা তার আগেই চোখ বড় বড় করে বলল, "আরে! জাফর ইকবাল সাহেব! কী সৌভাগ্য!"

আমি চোখ ছোট ছোট করে অনিক লুম্বার দিকে তাকিয়ে সে ঠাট্টা করছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম, এর আগে কেউ আমাকে দেখাটা সৌভাগ্য বলে

মনে করেনি। বরং উল্টোটা হয়েছে—দেখা মাত্রই কেমন জানি মুষড়ে পড়েছে। তবে অনিক লুম্বাকে দেখে মনে হলো মানুষটা আমাকে দেখে আসলেই খুশি হয়েছে। আমার হাত ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, "কী আশ্চর্য! আমি ঠিক আপনার কথাই ভাবছিলাম!"

যারা আমার কাছে টাকা-পয়সা পায় তারা ছাড়া অন্য কেউ আমার কথা ভাবতে পারে আমি চিন্তা করতে পারি না। অবাক হয়ে বললাম, "আমার কথা ভাবছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বসে বসে চিঠিপত্র লিখছিলাম। চিঠির শেষে নিজের নামের জায়গায় কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর না লিখে লিখছি অনিক লুম্বা! কী সহজ। কী আনন্দ। আপনার জন্যেই তো হলো।"

"সেটা তো আপনি নিজেই করতে পারতেন!"

"কিন্তু করি নাই। করা হয় নাই।" অনিক লুম্বা আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে বলল, "ভেতরে আসেন। বসেন।"

আমি না হয়ে অন্য যে কোন মানুষ হলে ভাবত ঘরে বসার জায়গা নাই। সোফার উপরে বইপত্র-খাতা-কলম এবং বালিশ। একটা চেয়ারের ওপর স্তূপ হয়ে থাকা কাপড়, শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি এবং আন্ডারওয়ার। টেবিলে নানা রকম যন্ত্রপাতি, প্লেটে উচ্ছিষ্ট খাবার, পেপসির বোতল। ঘরের দেওয়ালে কয়েকটা পোস্টার টেপ দিয়ে লাগানো। কয়েকটা শেলফ, শেলফে অনেক বই এবং নানা রকম কাগজপত্র। ঘরের মেঝেতে জুতো, স্যান্ডেল, খালি চিপসের প্যাকেট, কলম, পেন্সিল, নাট-বল্টু এবং নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। দেওয়ালে কটকটে একটা লাইট। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি অন্য যে কোন মানুষ এই ঘরে এলে বলত, "ইস! এই মানুষটা কী নোংরা, ঘরবাড়ি কী অগোছালো! ছিঃ!" কিন্তু আমার একবারও সেটা মনে হলো না— আমার মনে হলো আমি যেন একেবারে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছি। ঘরের নানা জায়গায় এই যন্ত্রপাতিগুলো ছড়ানো-ছিটানো না থাকলে এটা একেবারে আমার ঘর হতে পারত। সোফার কম্বল বালিশ একটু সরিয়ে আমি সাবধানে বসে পড়লাম, লক্ষ্য রাখলাম কোন কাগজপত্র যেন এতটুকু নড়চড় না হয়। যারা খুব গোছানো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ তাদের ধারণা অগোছালো মানুষের সবকিছু এলোমেলো, কিন্তু এটা সত্যি না। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি এই ঘরের ছড়ানো ছিটানো কাগজগুলো কোনটা কী সেটা অনিক লুম্বা জানে, আমি যদি একটু উনিশ-বিশ করে দেই তাহলে সে আর কোন দিন খুঁজে পাবে না। আমরা যারা অগোছালো



আর নোংরা মানুষ সবকিছুতেই আমাদের একটা সিস্টেম আছে, সাধারণ মানুষ সেটা জানে না।

অনিক লুম্বা জিজ্ঞেস করল, "কী খাবেন ? চা কফি ?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না, কোনটাই খাব না।"

অনিক লুম্বা তখন হা হা করে হাসতে লাগল। আমি বললাম, "কী হলো, হাসছেন কেন ?"

"হাসছি চিন্তা করে যদি আপনি বলতেন যে চা না হলে কফি খাবেন, তাহলে আমি কী করতাম ? আমার বাসায় চা আর কফি কোনটাই নাই।"

মানুষটাকে যতই দেখছি ততই আমার পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। আমি সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বললাম, "আমি যে হঠাৎ করে চলে এসেছি তাতে আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?"

"আপনি না হয়ে যদি অন্য কেউ হতো তাহলে অসুবিধে হতো। কী নিয়ে কথা বলতাম সেটা চিন্তা করেই পেতাম না।"

আমি সোজা হয়ে বসলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আমার সাথে আপনার কথা বলতে কোন অসুবিধে হবে না ?"

"মনে হয় হবে না।"

"কেন ?"

"কারণটা খুব সহজ।" অনিক লুম্বা আমার পায়ের দিকে দেখিয়ে বলল, "আপনার দু'পায়ে দু'রকম মোজা। যে মানুষ দু'পায়ে দু'রকম মোজা পরে কোথাও বেড়াতে চলে আসে তার সাথে আমার খাতির হওয়ার কথা!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন ?"

"এই যে এই জন্যে" বলে সে তার প্যান্টটা ওপরে তুলল এবং আমি হতবাক হয়ে দেখলাম তারও দুই পায়ে দুই রকম মোজা। ডান পায়ে লাল রঙের বাম পায়ে হলুদ চেক চেক। অনিক লুম্বা বলল, "আমি অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছি, কাউকে বোঝাতে পারি নাই যে দু'পায়ে একরকম মোজা পরার পিছনে কোন যুক্তি নেই। আপনি একমাত্র মানুষ যে নিজে থেকে আমার যুক্তি বিশ্বাস করেন।"

আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, "শুধু মোজা নয়, আপনার সাথে আমার আরও মিল আছে।"

অনিক লুম্বা অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"কী রকম মিল ?"

"আমার বাসা ঠিক এই রকম। সোফাতে বালিশ-কম্বল। চেয়ারে কাপড়-জামা। ফ্লোরে সব দরকারি কাগজপত্র।"

"কী আশ্চর্য!" অনিক লুম্বা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "আচ্ছা একটা জিনিস বলেন দেখি ?"

"কী জিনিস ?"

"মানুষ যখন গল্পগুজব করার সময় জোকস বলে আপনি সেগুলো ধরতে পারেন ?"

"বেশির ভাগ সময় ধরতে পারি না।"

অনিক লুম্বা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন আমাদের দু'জনের মাঝে অনেক মিল।"

তার কী কী খেতে ভাল লাগে সেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন ঘরের ভেতর থেকে হঠাৎ গুঞ্জনের মতো শব্দ হলো। শব্দটা হঠাৎ বাড়তে বাড়তে প্রায় প্লেনের ইঞ্জিনের মতো বিকট শব্দ করতে থাকে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কীসের শব্দ ?"

অনিক লুম্বা মাথা নেড়ে বলল, "মশা।"

"মশা!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "এটা কী রকম মশা ? একেবারে প্লেনের ইঞ্জিনের মতো শব্দ!"

"অনেক মশা। আমি মশার চাষ করি তো।"

"মশার চাষ ?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "মশার আবার চাষ করা যায় নাকি ?"

"করা যাবে না কেন ? মানুষ যদি সবজির চাষ করতে পারে, মাছের চাষ করতে পারে তাহলে মশার চাষ করতে পারবে না কেন ?"

আমি দুর্বলভাবে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করলাম, "সবজি আর মাছ তো মানুষ খেতে পারে। মশা কি খেতে পারে ?"

ছোট মানুষ অবুঝের মতো কথা বললে বড়রা যেভাবে হাসে অনিক লুম্বা অনেকটা সেভাবে হাসল, বলল, "শুধু খাবার জন্যে চাষ করতে হয় কে বলেছে ? গবেষণা করার জন্যেও চাষ করতে হয়। আপনার গলায় ইনফেকশন হলে গলা থেকে জীবাণু নিয়ে সেটা নিয়ে কালচার করে না ? সেটা কী ? সেটা হচ্ছে জীবাণুর চাষ।"

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "জীবাণুর চাষের ব্যাপারটা না হয় বুঝতে পারলাম অসুখ-বিসুখ হয়েছে কিনা দেখে। মশার চাষ দিয়ে কী দেখবেন ?"

অনিক লুম্বা মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের দেশে মশা একটা মহাসমস্যা, সেই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায় সেটা নিয়ে গবেষণা করার জন্যে দরকার মশা। অনেক মশা, লক্ষ লক্ষ মশা।"

"আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ মশা আছে ?"

"আছে। শুনলেন না শব্দ ? হঠাৎ করে যখন সেগুলো উড়তে থাকে তখন পাখার শব্দ শুনে মনে হয় প্লেন উড়ছে!" আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "দেখাবেন একটু ?"

"দেখবেন ?" অনিক লুম্বা দাঁড়িয়ে বলল, "আসেন। ভেতরে আসেন।"

আমি অনিক লুম্বার সাথে ভেতরে গেলাম। বাইরের ঘরটাই যথেষ্ট অগোছালো কিন্তু ভেতরে গিয়ে মনে হলো সেখানে সাইক্লোন বা টাইফুন হয়ে গেছে! যন্ত্রপাতি যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখানে কোনটা কী বোঝার কোন উপায় নেই। মাঝামাঝি একটা হলঘরের মতো, সেখানে একমাথা উঁচু একটা কাচের ঘর। আট-দশ ফুট চওড়া এবং নিচে পানি। দূর থেকে মনে হচ্ছিল ভিতরে ধোঁয়া পাক খাচ্ছে, কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম সেগুলো ধোঁয়া নয়—মশা। একসাথে কেউ কোনদিন এত মশা দেখেছে বলে মনে হয় না। কাচের ঘরের ভেতরে লক্ষ লক্ষ নয়—নিশ্চয়ই কোটি কোটি মশা! ছোট একটা মশাকে দেখে কেউ কখনো ভয় পায় না কিন্তু এই কাচের ঘরে কোটি কোটি মশা দেখে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "যদি কাচের ঘর ভেঙে মশা বের হয়ে যায় তখন কী হবে ?"

অনিক লুম্বা মেঝে থেকে একটা বিশাল হাতুড়ি তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেন, ভাঙার চেষ্টা করেন।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "সর্বনাশ! ভেঙে গেলে উপায় আছে ? সারা ঢাকা শহর মশায় অন্ধকার হয়ে যাবে!"

অনিক লুম্বা হাসল, বলল, "ভাঙবে না। এটা সাধারণ কাচ না। এর নাম প্লেক্সি গ্লাস। কাচের বাবা।"

তারপরেও আমি সাহস পেলাম না, তখন অনিক লুম্বা নিজেই হাতুড়ি দিয়ে এক ঘা দিল। কাচের ঘরের কিছুই হলো না সত্যি কিন্তু ভেতরে মশাগুলো যা খেপে উঠল সে আর বলার মতো না, মনে হলো পুরো ঘরটাই উড়িয়ে নিয়ে যাবে! কাচের ঘরের সমস্ত মশা একসাথে উড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে মনে হলো একটা ফাইটার প্লেন কোনভাবে ঘরে ঢুকে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এত মশার চাষ করছেন কেমন করে ?"

মশার শব্দে অনিক লুম্বা কিছু শুনল না, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আবার জিজ্ঞেস করতে হলো। অনিক লুম্বাও উত্তর দিল চিৎকার করে, "নিচে পানিতে

মশা ডিম পাড়ে। সেখান থেকে লার্ভা বের হয়, সেখান থেকে মশা। চব্বিশ ঘণ্টা এদের খাবার দেয়া হয়। মশা বড় হওয়ার জন্যে একেবারে সঠিক তাপমাত্রা, সঠিক হিউমিডিটির ব্যবস্থা আছে।"

আমি বললাম, "মশাগুলির উচিত শাস্তি হচ্ছে।"

অনিক লুম্বা অবাক হয়ে বলল, "উচিত শাস্তি ?"

"হ্যাঁ। কাচের ঘরের ভেতরে আটকা পড়ে আছে, কাউকে কামড়াতে পারছে না— এটা শাস্তি হলো না ?"

অনিক লুম্বা হা হা করে হেসে বলল, "না না। আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে মশার শাস্তি মোটেই হচ্ছে না।"

"তার মানে ? এরা এখনও মানুষকে কামড়াচ্ছে ?"

"একটা মশা মানুষকে কেন কামড়ায় জানেন ?"

এটা আবার একটা প্রশ্ন হলো নাকি! আমি বললাম, "অবশ্যই জানি। মশা মানুষকে কামড়ায় তাদেরকে জ্বালাতন করার জন্যে। কষ্ট দেবার জন্যে। অত্যাচার করার জন্যে।"

"উঁহু।" অনিক লুম্বা মাথা নাড়ল, বলল, "মশা মানুষকে কামড়ায় বংশ বৃদ্ধি করার জন্যে। মহিলা মশার ডিম পাড়ার জন্যে রক্তের দরকার সেই জন্যে তারা মানুষকে কামড়ে একটু রক্ত নিয়ে নেয়।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ। কাজেই যখন একটা মশা আপনাকে কামড় দিবে আপনি বুঝে নেবেন সেটা মশা নয়, সেটা হচ্ছে মশি।"

"মশি ?"

"হ্যাঁ। মানে মহিলা মশা।"

আমি তখনও ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে আপনি বলতে চান মশা আর মশিদের মাঝে মশারা কামড়ায় না, কামড়ায় শুধু মশি ?"

"হ্যাঁ।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমার ধারণা ছিল পুরুষ থেকে মহিলারা মিষ্টি স্বভাবের হয়। কামড়া-কামড়ি যা করার সেগুলো পুরুষেরাই বেশি করে!"

"না না না।" অনিক লুম্বা মাথা নাড়ল, "এটা মোটেও কামড়া-কামড়ি নয়। মহিলা মশারা যখন আপনাকে কামড় দেয় তখন সেটা তার নিজের জন্যে না। সেটা সে করে তার সন্তানদের জন্যে। মশার কামড় খুব মহৎ একটি বিষয়। সন্তানদের জন্যে মায়ের ভালবাসার বিষয়।"

"সর্বনাশ!" আমি বললাম, "ব্যাপারটা গোপন রাখা দরকার।"

অনিক লুম্বা অবাক হয়ে বলল, "কেন ?"

"দেশের পাগল ছাগল কবি সাহিত্যিকেরা এটা জানতে পারলে উপায় আছে ? কবিতা লিখে ফেলবে না মশার ওপর!

হে মশা
সন্তানের জন্যে
তোমার ভালবাসা"

অনিক লুম্বা আমার কবিতা শুনে হি হি করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। মহিলা মশারা যেন ঠিক করে বাচ্চাকাচ্চা দিতে পারে সেই জন্যে আমাকে এই কাচের ঘরে রক্ত সাপ্লাই দিতে হয়।"

"সর্বনাশ!" আমি আঁতকে উঠে বললাম, "বলেন কী আপনি ? কার রক্ত দেন এখানে ?"

অনিক লুম্বা আমাকে শান্ত করে বলল, "না, না, আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এখানে আমি মানুষের রক্ত দেই না। কসাইখানা থেকে গরু মহিষের রক্ত নিয়ে এসে সেটা দিই। খুব কায়দা করে দিতে হয়, না হলে খেতে চায় না।"

"গরু মহিষের রক্ত খায় মশা ?" আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষের রক্তের স্বাদ একবার পেয়ে গেলে তখন কী আর গরু-মহিষের রক্ত খেতে চাবে ?"

"আসলে মশার সবচেয়ে পছন্দ মহিষের রক্ত। তারপর গরু, তারপর মানুষ।"

"তাই নাকি ? মশার চোখে আমরা মহিষ এবং গরু থেকেও অধম ?"

অনিক লুম্বা হাসলেন, বললেন, "ঠিকই বলেছেন। মশাই ঠিক বুঝেছে। আমরা আসলেই মহিষ এবং গরু থেকে অধম।"

কাচের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ কোটি মশাকে কিলবিল কিলবিল করতে দেখে এক সময় আমার কেমন জানি গা গুলাতে শুরু করল। আমি বললাম, "অনেক মশা দেখা হলো। এখন যাই।"

"চলেন।" বলে অনিক লুম্বা ঘরের লাইট নিভিয়ে আমাকে নিয়ে বের হয়ে এলো।

বের হয়ে আসতে আসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি এখনও একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না।"

"কোনটা বুঝতে পারলেন না ?"

"মশার চাষ করছেন বুঝতে পারলাম, কিন্তু গবেষণাটা কী ?"

"খুব সহজ।" অনিক লুম্বা মুখ গম্ভীর করে বলল, "রক্ত ছাড়া অন্য কিছু খেয়ে মহিলা মশারা বাচ্চার জন্ম দিতে পারে কী-না।"

"তাতে লাভ ?"

"বুঝতে পারছেন না ? তখন মশারা আর মানুষকে কামড়াবে না। সেই অন্য কিছু খেয়েই খুশি থাকবে। মশা যদি মানুষকে না কামড়ায় তাহলে তাদের ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া ডেঙ্গু এই রোগও হবে না।"

অনিক লুম্বার বুদ্ধি শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। বললাম, "মশা যদি মানুষকে না কামড়ায় তাহলে মানুষ মশা নিয়ে বিরক্তও হবে না।"

"ঠিকই বলেছেন।"

"জোনাকী পোকা কিংবা প্রজাপতি এগুলোকে নিয়ে মানুষ কত কবিতা লিখেছে, তখন মশা নিয়েও কবিতা লিখবে।"

অনিক লুম্বা ভুরু কুঁচকে বলল, "সত্যি লিখবে ?"

"অবশ্যই লিখবে। জীবনানন্দ না মরণানন্দ নামে একজন কবি আছে সে লাশকাটা ঘরের উপরে কবিতা লিখে ফেলেছে, সেই তুলনায় মশা তো অনেক সম্মানজনক জিনিস।"

অনিক লুম্বা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন।"

আমি বললাম, "কবিদের কোন মাথার ঠিক আছে নাকি ? হয়তো লিখে ফেলবে—

হে মশা
তোমার পাখার পিনপিন শব্দে
আমার চোখে আর ঘুম আসে না!"

আমার কবিতা শুনে অনিক লুম্বা আবার হি হি করে হাসল। দু'জনে মিলে আমরা কবিদের পাগলামি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করলাম। আমাদের দুইজনের কারোই যে কবি হয়ে জন্ম হয় নাই সেটা চিন্তা করে দুইজনেই নিজেদের ভাগ্যকে শাবাশ দিলাম। তারপর সাহিত্যিকদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম। তারপর শিল্পী এবং গায়কদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম। তারপর উকিল আর ব্যবসায়ীদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম। অনিক লুম্বা বিজ্ঞানী আর আমি নিষ্কর্মা বেকার, তাই শুধু বিজ্ঞানী আর নিষ্কর্মা বেকার মানুষদের নিয়ে হাসাহাসি করলাম না। অনিক লুম্বা তখন কয়েকটা চিপসের প্যাকেট আর এক লিটারের পেপসির বোতল নিয়ে এলো। দুইজনে বসে চিপস আর পেপসি খেয়ে আরও কিছুক্ষণ আড্ডা মারলাম।

আমি যখন চলে আসি তখন অনিক লুম্বা আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "জাফর ইকবাল, যখন ইচ্ছা চলে এসো দুইজনে আড্ডা মারব।"

আমি বললাম, "আসব অনিক আসব। তুমি দেখো কালকেই চলে আসব।" খুব একটা উঁচুদরের রসিকতা করেছি এইরকম ভঙ্গি করে আমরা দুইজনই তখন হা হা করে হাসতে শুরু করলাম।

বাসায় আসার সময় হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম অনিক লুম্বার সাথে আমার নিশ্চয়ই এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমরা দুইজন খেয়াল না করেই একজন আরেকজনকে নাম ধরে ডাকছি, তুমি করে সম্বোধন করছি! কী আশ্চর্য ঘটনা, আমার মতো নীরস নিষ্কর্মা ভোঁতা টাইপের মানুষের একজন বন্ধু হয়ে গেছে ? আর সেই বন্ধু হেজিপেজি কোন মানুষ নয়— রীতিমতো একজন বিজ্ঞানী ?

অনিককে বলেছিলাম পরের দিনই তার বাসায় যাব কিন্তু আসলে তার বাসায় আমার যাওয়া হলো দু'দিন পর। সেদিনও হয়তো আমার যাওয়া হতো না কিন্তু অনিক দুপুরে ফোন করে বলল আমি যেন অবশ্য অবশ্যই তার বাসায় যাই খুব জরুরি দরকার। তাই বিকেলে অন্য একটা কাজ থাকলেও সেটা ফেলে আমি অনিকের বাসায় হাজির হলাম।

অনিক ছোট ছোট টেস্ট টিউবে ঝাঁঝালো গন্ধের কী এক তরল পদার্থ ঢালাঢালি করছিল, আমাকে দেখে মনে হলো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, "তুমি এসে গেছ ? চমৎকার!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন ? কী হয়েছে ?"

"একজন আমার সাথে দেখা করতে আসবে— আমি একা একা তার সাথে কথা বলতে চাই না।"

"কেন ?"

"সে আমার মশার গবেষণা কিনতে চায়।"

"মশার গবেষণা কিনতে চায় ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "গবেষণা কি কোরবানির গরু— মানুষ এটা আবার কিনে কী করে ? আর এই লোক খবর পেল কেমন করে যে তুমি মশা নিয়ে গবেষণা কর ?"

"পদচারী বিজ্ঞানী কনভেনশনের কথা মনে নাই ? মনে হয় সেখানে আমার মুখে শুনেছে। আমি কাউকে কাউকে বলেছিলাম।"

"কত দিয়ে গবেষণা কিনবে ?"

"সেটা তো জানি না। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি। টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলতে পারবে না ?"

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম, "আসলে সেটা আমি একেবারেই পারি না।"

"কেন? তুমি বাজার করো না? মাছ কিনো না?"

"ইয়ে-কিনি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"যেমন মনে কর গত সপ্তাহে মাছ কিনতে গিয়েছি, পাবদা মাছ, আমার কাছে চেয়েছে একশ' বিশ টাকা, আমি কিনেছি একশ' ত্রিশ টাকায়।"

"দশ টাকা বেশি দিয়েছ!"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"মাছওয়ালা তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে এমন একটা দুঃখের কাহিনী বলল যে আমার চোখে পানি এসে যাবার অবস্থা। দশ টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছি।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "ও, আচ্ছা।"

আমি লিখে দিতে পারি অনিক না হয়ে অন্য যে কেউ হলে আমার এই বোকামির কথা শুনে খ্যাক খ্যাক করে হাসা শুরু করত। অনিক শুধু যে হাসল না তা না আমার যুক্তিটা এক কথায় মেনেও নিল। একেই বলে প্রাণের বন্ধু।

আমি বললাম, "কাজেই আমি টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলতে পারব না, আমি বললে তোমার মনে হয় লাভ থেকে ক্ষতিই হবে বেশি।"

"হলে হোক। আমি তো আর বিক্রি করার জন্যে গবেষণা করি না। আমি গবেষণা করি মনের আনন্দের জন্যে।"

"তা ঠিক।" আমিও মাথা নাড়লাম, "মনের আনন্দের সাথে সাথে যদি একটু টাকা-পয়সা আসে খারাপ কী?"

"সেটা অবশ্য তুমি ভুল বল নাই।"

অনিক তার টেস্ট টিউব নিয়ে আবার ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মশা নিয়ে গবেষণার কী অবস্থা? মহিলা মশারা খেতে পছন্দ করে এরকম কিছু কী এখনো খুঁজে বের করেছ?"

"উঁহুঁ। কাজটা সোজা না।"

"লেবুর শরবত দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছ?"

"লেবুর শরবত?" অনিক অবাক হয়ে বলল, "লেবুর শরবত কেন?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা জানি না। আমার কাছে মনে হলো মহিলা মশারা হয়তো লেবুর শরবত খেতে পছন্দ করবে।"

অনিক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কথা শুনে বোঝা যায় তোমার ভেতরে কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক চিন্তা থাকলে যুক্তিতর্ক দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এমনি এমনি তখন কেউ কোন একটা কথা বলে না।"

আমি বললাম, "ধুর। যুক্তিফুক্তি আমার ভাল লাগে না। যখন যেটা মনে হয় আমি সেটাই করে ফেলি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, সেদিন মতিঝিলে যাব, যে বাসটা এসেছে সেটা ভাঙাচোরা দেখে পছন্দ হলো না। চকচকে একটা বাস দেখে উঠে পড়লাম, বাসটা আমাকে মিরপুর বারো নম্বরে নামিয়ে দিল।"

"কিন্তু, কিন্তু—" অনিক ঠিক বুঝতে পারল না কী বলবে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার না মতিঝিলে যাবার কথা?"

আমি বললাম, "কপালে না থাকলে যাব কেমন করে?"

হাজার হলেও অনিক বিজ্ঞানী মানুষ, তার কাজকারবারই হচ্ছে যুক্তিতর্ক নিয়ে, কাজেই আমার সাথে একটা তর্ক শুরু করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখন দরজায় শব্দ হলো। মনে হয় মশার গবেষণা কেনার মানুষটা চলে এসেছে।

অনিক দরজা খুলে দিতেই মানুষটা এসে ঢুকল, মোটাসোটা নাদুস-নুদুস মানুষ, চেহারায় একটা তেলতেলে ভাব। ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ। সরু গোঁফ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। গোঁফ রাখতে চাইলে সেটা রাখা উচিত বঙ্গবন্ধুর মতো, তার মাঝে একটা ব্যক্তিত্ব আছে। মানুষটা স্যুট-টাই পরে আছে, চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। গায়ের রঙ ফর্সা, ফর্সার মাঝে কেমন যেন অসুস্থ অসুস্থ ভাব। হঠাৎ হঠাৎ এক ধরনের তেলাপোকা দেখা যায় যেগুলো সাদা রঙের, দেখতে অনেকটা সেরকম, দেখে কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না লাগে।

মানুষটা অনিকের দিকে তাকিয়ে তেলতেলে একটা হাসি দিয়ে বলল, "কী খবর বিজ্ঞানী সাহেব? কেমন আছেন?"

অনিক বলল, "ভাল। আসেন ভেতরে, আসেন।"

মানুষটা ভেতর এসে ভুরু কুঁচকে চারিদিকে তাকাল। অনিক বেচারা ঘরটা পরিষ্কার করার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন লাভ হয় নাই। যারা নোংরা এবং অগোছালো মানুষ তারা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার চেষ্টা করলে সেটা দেখতে আরও বদখত দেখায়। মানুষটা ঘরটার ওপর চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকাল এবং আমাকে দেখে মুখটা কেমন যেন কুঁচকে ফেলল, তাকে দেখে মনে হলো সে যেন আমাকে দেখছে না, একটা ধাড়ী চিকাকে দেখছে। অনিক তখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বলল, "এ আমার বিশেষ বন্ধু। নাম জাফর ইকবাল।"

"ও।" মানুষটা কিছুক্ষণ আমাকে পর্যবেক্ষণ করে বলল, "আমার নাম আক্কাস আকন্দ।"

আমি মনে মনে বললাম, "ব্যাটা বুড়া ভাম কোথাকার। তোমার নাম হওয়া উচিত খোক্কস আকন্দ।" আর মুখে বললাম, "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম আকন্দ সাহেব।"

খোক্কস আকন্দ তখন কেমন জানি দুলে দুলে গিয়ে সোফায় বসে আবার তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে দেখতে লাগল।

অনিক জিজ্ঞেস করল, "আমার বাসা পেতে কোন ঝামেলা হয়েছে আকন্দ সাহেব?"

"নাহ। বাসা পেতে কোন ঝামেলা হয় নাই। তবে— " আকন্দ সাহেব নাক দিয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ করে বলল, "বাসায় আসতে একটু ঝামেলা হয়েছে।"

অনিক একটু থতমত খেয়ে বলল, "কী রকম ঝামেলা?"

"বাসার গলি খুব চিকন। আমার গাড়ি ঢোকানো গেল না। সেই মোড়ে পার্ক করে রেখে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে।"

ব্যাটার ফুটানি দেখে মরে যাই। একবার ইচ্ছা হলো বলি, "তোমারে আসতে বলেছে কে?" কিন্তু কিছু বললাম না।

অনিক বলল, "চা কফি কিছু খাবেন?"

খোক্কস আকন্দ বলল, "না। আমি চা কফি সাধারণত খাই না। যেটা সাধারণত খাই সেটা আপনি খাওয়াতে পারবেন না!" বলে খোক্কস আকন্দ কেমন যেন দুলে দুলে হাসতে লাগল, ভাব দেখে মনে হলো সে বুঝি খুব একটা রসিকতা করে ফেলেছে।

অনিক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, এখন আমিও জানি তার বাসায় চা কিংবা কফি কোনটাই নাই। খোক্কস আকন্দ এক সময় হাসি থামিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, "এখন কাজের কথায় আসা যাক বিজ্ঞানী সাহেব, কী বলেন?"

অনিক অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"আপনি বলেছেন, আপনি মশা মারার একটা ওষুধ বানাচ্ছেন।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি সেটা বলি নাই, আমি বলেছি মশার সমস্যা দূর করে দেবার একটা সিস্টেম দাঁড়া করাচ্ছি।"

খোক্কস আকন্দ বলল, "একই কথা। মশাকে না মেরে মশার সমস্যা দূর করবেন কেমন করে?"

অনিক বলল, "মশা একটা সমস্যা কারণ মশা কামড়ায়। আর মশা কামড়ায় বলেই মানুষের অসুখ-বিসুখ হয়। আমি গবেষণা করছি যেন মশা আর মানুষকে না কামড়ায়।"

"না কামড়ায়?" খোক্কস আকন্দ তার খোলা ধরনের চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "মশা মানুষকে কামড়াবে না?"

"না। সেইটাই বের করার চেষ্টা করছি।"

খোক্কস আকন্দ বলল, "আমরা কেমন করে বুঝব যে আপনি ঠিক ঠিক গবেষণা করেছেন? মশা আসলেই কামড়াচ্ছে না?"

অনিক দাঁড়িয়ে বলল, "আসেন, আপনাকে দেখাই। ভেতরে আসেন।"

অনিক খোক্কস আকন্দকে ভেতরে নিয়ে গেল, মশার ঘরের সামনে গিয়ে লাইট জ্বালাতেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মশা ভনভন শব্দ করে উড়তে শুরু করল। খোক্কস আকন্দ মুখ হা করে এই বিচিত্র দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। অনিক মশার শব্দ ছাপিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, "এখন যদি কেউ এই ঘরে ঢুকে তাহলে মশা এক মিনিটের মাঝে তার রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে। খালি মানুষটার ছোবড়া পড়ে থাকবে।"

খোক্কস আকন্দ একবার মুখ বন্ধ করে আবার খুলে বলল, "ছোবড়া?"

"হ্যাঁ। ছোবড়া।" অনিক মাথা নেড়ে বলল, "আর যদি ঠিক ঠিক গবেষণা করে মশাকে অন্য কিছু খাওয়ানো শেখাতে পারি তাহলে যে কোন মানুষ এর ভেতরে বসে থাকতে পারবে, মশা তাকে কামড়াবে না!"

খোক্কস আকন্দ অনেকক্ষণ মশার ঘরের ভেতর লক্ষ লক্ষ কিলবিলে মশার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর আবার বসার ঘরে এসে বসল। কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এটা আবিষ্কার করতে আপনার কতদিন লাগবে?"

"আবিষ্কারের কথা কেউ বলতে পারে না। কালকেও হতে পারে আবার এক বছরও লাগতে পারে।"

খোক্কস আকন্দ তার মুখে তেলতেলে হাসিটা ফুটিয়ে বলল, "যদি আপনার এই আবিষ্কারটা হয়ে যায় তাহলে আমি সেটা কিনে নেব।"

অনিক বলল, "কিনে নেবেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কত টাকা দিয়ে কিনবেন?"

খোক্কস আকন্দ কেমন যেন বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, "এইখানে টাকার পরিমাণটা কোন ইস্যু না। কেনার সিদ্ধান্তটা হচ্ছে ইস্যু।"

অনিক আমাকে খবর দিয়ে এনেছে এই লোকের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে, আমি তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না, জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ঠিক কী জিনিসটা কিনবেন?"

"সব কিছু। গবেষণার ফল। মশার ঘর। মশা। মশার বাচ্চাকাচ্চা।"

"কেন কিনবেন?"

খোক্কস আকন্দ হা হা করে হাসতে শুরু করল, একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, "আমার কাজ হচ্ছে এক জায়গা থেকে একটা জিনিস কিনে অন্য জায়গায় বিক্রি করা।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "এটা আপনি কার কাছে বিক্রি করবেন?"

"সেটা শুনে আপনি কী করবেন? আপনি বিজ্ঞানী মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কার করবেন। আমি ব্যবসায়ী মানুষ আমি সেটা দিয়ে ব্যবসা করব।"

আমি বললাম, "কিন্তু কত টাকা দিয়ে কিনবেন বললেন না?"

খোক্কস আকন্দ বলল, "আপনি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এই আবিষ্কার যতো টাকা দিয়ে কেনা উচিত ঠিক ততো টাকা দিয়ে কিনব।"

অনিক আমাকে ডেকে এনেছে কথাবার্তা বলার জন্যে কাজেই আমি চেষ্টা করলাম ব্যবসায়িক কথা বলার জন্যে। বললাম, "আপনি মশার ঘর আর মশাও কিনবেন?"

"হ্যাঁ।"

"একটা মশার জন্যে আপনি কত দেবেন?"

খোক্কস আকন্দ চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল, বলল, "একটা মশার জন্যে?"

"হ্যাঁ। এতগুলো মশা তো আর এমনি এমনি দেয়া যাবে না। রীতিমতো চাষ করে এই মশা তৈরি হয়েছে। কী পুরুষ্টু এক একটা মশা দেখেছেন? কত করে দেবেন?"

খোক্কস আকন্দ চোখ ছোট করে বলল, "আপনি কত করে চাচ্ছেন?" আমি কত বলা যায় অনুমান করার জন্যে অনিকের দিকে তাকালাম কিন্তু অনিক হাত নেড়ে বলল, "এসব আলোচনা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে আমার গবেষণা শেষ হোক।"

খোক্কস আকন্দ বলল, "ঠিক আছে।" তারপর সে তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তাহলে উঠি।" অনিক আবার ভদ্রতা করে বলল, "চা কফি কিছু খেলেন না।"

"আপনার আবিষ্কার শেষ হোক। তখন শুধু চা কফি না, আরও অনেক কিছু খাব।" বলে সে এমনভাবে অনিকের দিকে তাকাল যে আমার মনে হলো যেন সে তাকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবে।

আমার মানুষটাকে একেবারেই পছন্দ হলো না, এখান থেকে বিদায় হলে বাঁচি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খোক্কস আকন্দ আবার ঘুরে অনিকের দিকে তাকাল, বলল, "আমি যদি আমার দু'জন অফিসারকে আপনার এই সেটআপ দেখার জন্যে পাঠাই আপনার আপত্তি আছে?"

আমার ইচ্ছে হলো বলি, "অবশ্যই আপত্তি আছে।" কিন্তু অনিক মাথা নেড়ে বলল, "না, না আপত্তি থাকবে কেন?"

আমি মুখ ভোঁতা করে বললাম, "আপনার অফিসাররা কেন আসবেন?"

খোক্কস আকন্দ বলল, "দেখার জন্যে। শুধু দেখার জন্যে।"

খোক্কস আকন্দ বের হয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করে অনিক ফিরে আসতেই আমি বললাম, "অনিক তোমাকে আমি সাবধান করে দিই। এই মানুষ থেকে একশ' মাইল দূরে থাকতে হবে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "একশ' মাইল দূরে থাকতে হবে কেন? আমার তো আক্কাস আকন্দ সাহেবকে বেশ পছন্দই হলো।"

"আক্কাস আকন্দ নয়। খোক্কস আকন্দ।"

"খোক্কস আকন্দ?"

"হ্যাঁ। রাক্ষসের ভাই খোক্কস। তোমার রক্ত-মাংস চুষে খাবে, তারপর তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।"

অনিক আমার কথা শুনে চোখ বড় বড় করে বলল, "কী আশ্চর্য! এই ভদ্রলোককে তুমি দশ মিনিট দেখেছ কিনা সন্দেহ অথচ তার সম্পর্কে কত খারাপ খারাপ কথা বলে ফেললে!"

"আমি খারাপ কথা বলি নাই। সত্যি কথা বলেছি। এই লোক মহাধুরন্ধর। মহাডেঞ্জেরাস। মহাবদমাইশ।"

অনিক বলল, "না, না জাফর ইকবাল, একজন মানুষ সম্পর্কে এরকম কথা বলার কোন যুক্তি নেই। যুক্তি ছাড়া কথা বলা ঠিক না। যুক্তি ছাড়া কথা বলা অবৈজ্ঞানিক।"

আমি রেগেমেগে বললাম, "তুমি বিজ্ঞানী মানুষ ইচ্ছে হলে তুমি বৈজ্ঞানিক কথা বলো। আমার এত বৈজ্ঞানিক কথা বলার দরকার নাই।"

অনিক বলল, "আরে, আরে! তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?"

আমি চিৎকার করে পা দাপিয়ে বললাম, "আমি মোটেই রাগি নাই। কথা নাই বার্তা নাই আমি কেন রাগব? কার ওপর রাগব?" এই বলে আমি রেগেমেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

দুইদিন পর আমি আবার অনিকের সাথে দেখা করতে গেলাম। এর আগের দিন আমি রেগেমেগে বের হয়ে গিয়েছিলাম বলে একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল, অনিক সেটা নিয়ে আমার ওপর রেগে আছে কিনা কে জানে। দরজায় শব্দ করার সাথে সাথে অনিক দরজা খুলল, আমাকে দেখে কেমন যেন ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ও তুমি? আস, ভেতরে আস।"

আমি ভেতরে ঢুকলাম, আজাকে ঘরদোর আগের মতোন, অগোছালো এবং নোংরা। টেবিলের ওপর একটা ফাইল, সেখানে কিছু কাগজপত্র। অনিক ফাইলটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এইটা কী?"

অনিক দুর্বল গলায় বলল, "কিছু না।"

আমি বললাম, "কিছু না মানে? আমি স্পষ্ট দেখছি একশ' টাকার স্ট্যাম্পের ওপর কী কী লেখা—তুমি মামলা করছ নাকি?"

"না, না। মামলা করব কেন?"

"তাহলে স্ট্যাম্পের ওপর এত সব লেখালেখি করার তোমার দরকার কী পড়ল?" অনিক আমার কড়া চোখ থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে আমতা আমতা করে বলল, "না, মানে— আক্কাস আকন্দের লোকজন এসেছিল তো, তারা আমার সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করে গেছে। সেই কন্ট্রাক্টটা একটু দেখছিলাম।"

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, "এর মাঝে তুমি কন্ট্রাক্ট সাইন করে ফেলেছ? তুমি দেখি আমার থেকে বেকুব।"

এবারে অনিক রেগে উঠে বলল, "এর মাঝে তুমি বেকুবির কী দেখলে?"

"কন্ট্রাক্টে কী লেখা আছে? কত টাকায় তুমি তোমার আবিষ্কার বিক্রি করে দিলে?"

"টাকার পরিমাণ লেখা হয় নাই।" অনিক মুখ শক্ত করে বলল, "আবিষ্কারটা হওয়ার পর আক্কাস আকন্দ সেটা কিনে নেবে সেটাই লেখা হয়েছে।"

আমি অনিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তাহলে তুমি এরকম মনমরা হয়ে বসে আছ কেন?"

"আমি মোটেও মনমরা হয়ে বসে নাই।" বলে অনিক আরও মনমরা হয়ে গেল।

আমি বললাম, "আমার কাছে লুকানোর চেষ্টা করছ কেন? সত্যি কথাটা বলে ফেল কী হয়েছে।"

"কিছু হয় নাই। শুধু—"

"শুধু কী?"

অনিক দুর্বল গলায় বলল, "আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।"

"কী বুঝতে পারছ না?"

"এই কন্ট্রাক্ট সাইন করার পর আক্কাস আকন্দের লোকগুলো আমাকে একটা পানির বোতল এক কেজি গুড় আর আধ কেজি লবণ দিয়ে গেল কেন?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী দিয়ে গেল?"

"এক বোতল পানি, এক কেজি গুড় আর আধ কেজি লবণ।" অনিক মাথা চুলকে বলল, "আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কেন, তখন বলল, কন্ট্রাক্টে নাকি এটা দেয়ার কথা লেখা আছে। কিন্তু কন্ট্রাক্টে কোথাও সেটা খুঁজে পেলাম না।"

"দেখি কন্ট্রাক্টটা।"

অনিক কেমন যেন অনিচ্ছা নিয়ে আমাকে কন্ট্রাক্টটা ধরিয়ে দিল। সেটা দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। এই মোটা কাগজের বাণ্ডিল কমপক্ষে চল্লিশ পৃষ্ঠা, পড়ে শেষ করতে একবেলা লেগে যাবে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "এত মোটা?"

অনিক মাথা চুলকে বলল, "হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারলাম না এত মোটা কেন।"

"কী লেখা এখানে, দেখি তো" বলে আমি সেই বিশাল দলিল পড়ার চেষ্টা করলাম, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা শুরু হয়েছে এভাবে :

"কুতুব আলী মুহম্মদ ছগীর উদ্দিন নাফছি জাহাঙ্গীর ওরফে অনিক লুম্বা সাং ১৪২ ঘটিমাছি লেন ঢাকার সহিত আকন্দ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী আক্কাস আকন্দের আইন কৌসুলির পক্ষে কেরামত মাওলা এসোসিয়েটসের আইনজীবী মাওলাবক্স কর্তৃক প্রস্তাবনামা প্রস্তুত নিমিত্তে প্রাথমিক অঙ্গীকারনামায় যথাক্রমে প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয়পক্ষ হিসেবে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ অথবা তাহাদের দেয়া কর্তৃত্বনামায় উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবর্গকে ওকালতনামা দেয়া সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামায় সুষ্ঠু প্রস্তাবনার পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষের আইনগত কৌসুলি তৃতীয় পক্ষের সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের অঙ্গীকারনামায় চতুর্থ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রথম পক্ষের সহিত কর্তৃত্ব প্রস্তুতের তালিকা বর্ণিত হইল।"

আমি আমার জীবনে এর আগে এত বড় একটা বাক্য পড়িনি। বাক্যটা পরপর পাঁচবার পড়েও এর অর্থ বোঝা দূরে থাকুক কী বলতে চেয়েছে বুঝতে পারলাম না। তখন বাক্যটা একবার উল্টাদিক থেকে পড়লাম আরেকবার আরবি ভাষার মতো ডানদিক থেকে বামদিকে পড়লাম তারপরও কিছু বুঝতে পারলাম না, উপর থেকে নিচে পড়ে দেখব কিনা ভাবলাম কিন্তু ততক্ষণে টনটন করে আমার মাথাব্যথা করতে শুরু করেছে তাই আর সাহস করলাম না। আমি কাগজের বাণ্ডিলটা অনিকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "প্রথম বাক্যটা পড়েই মাথা ধরে গেছে, পুরো চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়লে ব্রেনের রগ নির্ঘাত ছিঁড়ে যাবে।"

"পড়ার দরকার কী!" অনিক পুরো বিষয়টা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "বলেই তো দিয়েছে এখানে কী লেখা। আমার আবিষ্কারটা শেষ হবার পর সেটা কিনে নেবে। শুধু—" অনিক ইতস্তত করে থেমে গেল।

"শুধু কী?"

"এক বোতল পানি, এক কেজি গুড় আর আধ কেজি লবণের ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।"

"তোমাকে দিয়েছে খাবারের স্যালাইন বানিয়ে খাওয়ার জন্যে। মনে নাই এক গ্লাস পানিতে একমুঠি গুড়, আর এক চিমটি লবণ দিয়ে খাবার স্যালাইন বানাতে হয়।"

"হ্যাঁ।" অনিক মাথা নেড়ে বলল, "সেটা তো বানায় যখন মানুষের ডায়রিয়া হয় তখন। এখানে কার ডায়রিয়া হয়েছে ?"

আমি বললাম, "এখনও হয় নাই। কিন্তু হবে।"

"কার হবে ?"

"নিশ্চয়ই তোমার হবে।"

অনিক ভয় পেয়ে বলল, "কেন ? আমার কেন হবে ?"

"সেটা এখনও জানি না। কিন্তু মানুষ যখন ভয় পেয়ে যায় তখন তার ডায়রিয়া হয়। তুমিও নিশ্চয়ই ভয় পাবে।"

অনিকের মুখটা শুকিয়ে গেল। আমি বললাম, "মনে নাই, আমি তোমাকে বলেছিলাম খোক্কস আকন্দ তোমার রক্ত মাংস চুষে খাবে, তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে! তুমি দেখ, আমার কথা যদি সত্যি না বের হয়।"

আমার কথা শুনে অনিকের মুখটা আরও শুকিয়ে গেল।

এরপর বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, অনিকের বাসায় প্রতিদিন না গেলেও আমি টেলিফোনে প্রত্যেক দিনই খোঁজ নিয়েছি। আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে খোক্কস আকন্দ তার লোকজন পাঠিয়ে অনিকের কিছু একটা করে ফেলবে, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। একদিন দুইদিন করে মাসখানেক কেটে যাবার পর আমার মনে হতে লাগল যে আমি হয়তো শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছিলাম। খোক্কস আকন্দ মানুষটাকে যতটা খারাপ ভেবেছিলাম সে হয়তো তত খারাপ না, তাকে খোক্কস না ডেকে আক্কাস ডাকা যায় কিনা সেটাও আমি চিন্তা করে দেখতে শুরু করলাম।

এদিকে অনিক তার গবেষণা চালিয়ে গেল, মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল তার গবেষণা খুব ভাল হচ্ছে আবার দু'দিন পরে মনে হতে লাগল পুরো গবেষণা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আমি অনিকের ধৈর্য দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। তার জায়গায় হলে আমি মনে হয় এতদিনে মশার ঘর ভেঙেচুরে আগুন জ্বালিয়ে দিতাম। কিন্তু অনিক সেরকম কিছু করল না, আলকাতরা থেকে শুরু করে রসগোল্লার রস, ডাবের পানি থেকে শুরু করে মাদার গাছের কস কোন কিছুই সে বাকি রাখল না, সব কিছু দিয়ে পরীক্ষা করে ফেলল। এক সময় যখন মনে হলো পৃথিবীর আর কিছুই পরীক্ষা করার বাকি নেই, এখন ভেউ ভেউ করে

কান্নাকাটি করে চোখের পানি ফেলার সময়, আর সেই চোখের পানিটাই শুধু পরীক্ষা করা বাকি আছে তখন হঠাৎ করে অনিকের গবেষণার ফল পাওয়া গেল। একদিন বিকাল বেলা অনিক আমাকে ফোন করে চিৎকার করতে লাগল, "ইউরেকা ইউরেকা"।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "তুমি কাপড়-জামা পরে আছ তো ?"

অনিক বলল, "কাপড়-জামা পরে থাকব না কেন ?"

আমি বললাম, "মনে নাই, আর্কিমিডিস কাপড়-জামা খুলে ন্যাংটো হয়ে ইউরেকা ইউরেকা বলে রাস্তাঘাটে চিৎকার করছিল ?"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ আমারও মনে হচ্ছে সেটা করে ফেলি। পুরো ন্যাংটো না হলেও অন্ততঃ একটা লুঙ্গি মালকোচা করে পরে রাস্তাঘাটে ছোটাছুটি করি! পিচকারি দিয়ে সবার ওপরে রং ফেলতে থাকি।"

আমি বললাম, "খবরদার! ওরকম কিছু করতে যেও না। পাবলিক ধরে যা একটা মার দিবে, তখন একটা কিলও কিন্তু মাটিতে পড়বে না।"

"তা অবশ্যি তুমি ভুল বলো নাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন বলো তুমি আবিষ্কারটা কী করলে ? মহিলা মশারা রক্তের বদলে অন্য কিছু খেতে রাজি হয়েছে ?"

"হয় নাই মানে ? সাংঘাতিকভাবে হয়েছে!"

"সেটা কী জিনিস ?"

অনিক বলল, "সেটা একটা জিনিস না। অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস মিশাতে হয়েছে। সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে ইথাইল এলকোহল। সেটাতেই অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। তার সাথে মনো সোডিয়াম গ্লুকোমেট, সোডিয়াম বাই কার্বনেট আর—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এগুলো আমাকে বলে লাভ নাই। এইসব ক্যামিকেল কোনটা কী আমি কিছুই জানি না। কোন দিন দেখি নাই, নাম শুনি নাই—"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "শুনেছ। শুনেছ। অবশ্যই নাম শুনেছ। সবাই ইথাইল এলকোহলের নাম শুনেছে। এইটার গন্ধেই মহিলা মশারা পাগল হয়ে যায়।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। ইথাইল এলকোহল হচ্ছে—"

আমি বললাম, "থাক, থাক। টেলিফোনে বলে লাভ নাই। আমি চলে আসি, তুমি বরং সামনাসামনি দেখাও।"

অনিক জিব দিয়ে চটাস করে শব্দ করে বলল, "সেইটাই ভাল। এত বড় একটা আবিষ্কার করলাম, কাউকে দেখানোর জন্যে হাত পা চোখ মাথা চুল নখ সবকিছু নিশপিশ নিশপিশ করছে।"

আমি বললাম, "বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা, তুমি আর একটু ধৈর্য ধরো, আমি এক্ষুণি চলে আসছি।"

আমার অনিকের বাসায় যেতে আধা ঘণ্টার মতো সময় লাগল, গিয়ে দেখি সেখানে দুইজন স্যুট পরা মানুষ বসে আছে। একজন মোটা আরেকজন চিকন। একজন ফর্সা আরেকজন রীতিমতো কালো। একজনের মাথায় চকচকে টাক অন্যজনের মাথায় ঘন চুল। একজনের গোঁফ অন্যজনের দাড়ি। কিন্তু কী একটা বিষয়ে দুইজনের মিল আছে, দেখলেই মনে হয় দুইজন আসলে একইরকম। আমাকে দেখে অনিক শুকনো গলায় বলল, "জাফর ইকবাল, এই দেখ, আক্কাস আকন্দ সাহেবের দুই এটর্নি চলে এসেছেন।"

"দুই এটর্নি?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "কেন?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

মোটা, ফরসা, মাথায় টাক এবং গোঁফওয়ালা মানুষটা বলল, "কেন? না বোঝার কী আছে? মনে নেই আপনি আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট সাইন করলেন যে গবেষণাটা বিক্রি করবেন?"

চিকন, কালো, মাথায় চুল এবং ঘন দাড়িওয়ালা মানুষটা বলল, "আমরা এখন বিক্রির কাজটা শেষ করতে এসেছি।"

অনিক বলল, "কিন্তু কিন্তু—"

মোটা মানুষ বলল, "কিন্তু কী?"

"আপনি কেমন করে বুঝতে পারলেন আমার আবিষ্কার হয়ে গেছে? এটা তো আমি জাফর ইকবাল ছাড়া আর কাউকে বলিনি।"

চিকন মানুষ চোখ লাল করে বলল, "আমরা সেটা সন্দেহ করেছিলাম যে আপনি আপনার আবিষ্কারের কথা গোপন রাখতে পারেন।"

মোটা বলল, "কন্ট্রাক্টের একুশ পাতায় স্পষ্ট লেখা আছে আবিষ্কারের দুই মিনিট একত্রিশ সেকেন্ডের ভেতরে আপনি আমাদের ফোন করে জানাবেন।"

চিকন বলল, "আপনি জানান নাই। সেইটা কন্ট্রাক্টের বরখেলাপ।"

মোটা বলল, "তেরো পাতার এগারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা।"

অনিক চোখ কপালে তুলে বলল, "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা! আমার বিরুদ্ধে?"

মোটা বলল, "আমরা বুদ্ধি করে আপনার টেলিফোনে আড়ি পেতেছিলাম বলে কোনমতে খবর পেয়েছি।"

অনিক রেগে আগুন হয়ে বলল, "আপনাদের এত বড় সাহস আমার টেলিফোনে আড়ি পাতেন?"

চিকন বলল, "কী আশ্চর্য! কন্ট্রাক্টের এগারো পাতার নয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট লেখা আছে আপনি আমাদের আড়ি পাতার অনুমতি দিয়েছেন।"

মোটা বলল, "আড়ি পাতার জন্যে যত খরচ হয়েছে সেটা আপনার গবেষণার মূল্য থেকে কেটে নেয়া হবে।"

আমার পক্ষে আর শোনা সহ্য করা সম্ভব হলো না, আমি মেঝে থেকে একটা লোহার রড তুলে হুংকার দিয়ে বললাম, "তবেরে বজ্জাত বদমাইশ বেশরমের দল। আজ তোদের একদিন কী আমার একদিন। যদি আমি পিটিয়ে তোদের তক্তা না বানাই, ঠ্যাং ভেঙে লুলা না করে দেই, মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে না ফেলি তাহলে আমার নাম জাফর ইকবাল না—"

আমার এই হুংকার শুনে মোটা এবং চিকন এতটুকু ভয় পেল বলে মনে হলো না। মোটা পকেট থেকে একটা ছোট ক্যামেরা বের করে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে আমার ছবি তুলতে লাগল, চিকন একটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার বের করে আমার হুংকার রেকর্ড করতে শুরু করে দিল। আমি বললাম, "বের হ এখান থেকে, বেজন্মার দল।"

মোটা বলল, "ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার অপচেষ্টা। সব প্রমাণ আছে। ক্যামেরায় ছবি। ক্যাসেটে কথা। চৌদ্দ বছর জেল।"

চিকন বলল, "তার সাথে মানহানির মামলা জুড়ে দেব। স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি ক্রোক করে নেব।"

মোটা বলল, "মামলা চলবে দুই বছর। সব খরচপাতি আপনার।"

চিকন বলল, "অস্ত্রসহ গ্রেফতার করতে হবে। তাহলে চুয়ান্ন ধারায় ফেলা যাবে—"

আমি আরেকটু হলে লোহার রড দিয়ে মেরেই বসেছিলাম, অনিক কোনভাবে আমাকে থামাল। ফিসফিস করে বলল, "সাবধান জাফর ইকবাল, এরা খুব ডেঞ্জারাস। তোমার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। হাত থেকে রড ফেলে শান্ত হয়ে বসো। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।"

আমি রাজি হচ্ছিলাম না, অনিক কষ্ট করে আমাকে শান্ত করে বসাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী চান?"

মোটা তার মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল, "এই তো ভাল মানুষের মতো কথা! রাগারাগি করে কোন কাজ হয় না।"

চিকন বলল, "আমরা এসেছি কন্ট্রাক্টের লেখা অনুযায়ী আপনার আবিষ্কার, মশার ঘর, মশা, মশার বাচ্চাকাচ্চা সব কিছু কিনে নিতে।"

আমি জিজ্ঞেস করলমা, "সব কিছু আপনারা কত দিয়ে কিনবেন ?"

মোটা বলল, "হিসাব না করে সেটা তো বলতে পারব না।"

আমি বললাম, "করেন হিসাব।"

তখন মোটা আর চিকন মিলে হিসাব করতে লাগল। কাগজের মাঝে অনেক সংখ্যা লিখে সেটা যোগ-বিয়োগ করতে লাগল, পকেট থেকে ক্যালকুলেটর বের করে সেটা দিয়ে হিসাব করে শেষপর্যন্ত মোটা বলল, "আপনার পুরো গবেষণা, মশার ঘর, মশা, তার বাচ্চাকাচ্চা সবকিছু কিনতে আপনাকে দিতে হবে সাতশ' চল্লিশ টাকা।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সাতশ' চল্লিশ টাকা ?"

"হ্যাঁ।" চিকন আঙুল দিয়ে অনিককে দেখিয়ে বলল, "আপনি দিবেন।"

অনিক তখনও তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার বলল, "আমি দিব ?"

মোটা বলল, "হ্যাঁ। কন্ট্রাক্টের উনত্রিশ পৃষ্ঠার ছয় অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে এই আবিষ্কারের জন্যে আপনাকে আঠাইশ দিন সময় দেয়া হয়েছে। আঠাইশ দিন পার হবার পর প্রত্যেক দিন আপনার জরিমানা সাত হাজার একুশ টাকা করে।"

অনিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না; কোনমতে বলল, "আমার জরিমানা ?"

চিকন বলল, "আপনার কপাল ভাল। এই আবিষ্কার করতে যদি আপনার আরও মাসখানেক লেগে যেত তাহলে আপনার এই বাসা আমাদের ক্রোক করে নিতে হতো।"

অনিক কিছুক্ষণ ঘোলা চোখে মানুষ দুইজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর কেমন জানি ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "শুধু একটা জিনিস বলবেন ?"

মোটা বলল, "কী জিনিস ?"

"আমি আমার বাসায় বসে, আমার ল্যাবরেটরিতে আসার সময় আমার মতো করে গবেষণা করছি, আপনারা আমাকে জরিমানা করার কে ?"

চিকন চোখ কপালে তুলে বলল, "কী আশ্চর্য! আপনার পুরো গবেষণাটার অর্থায়ন করেছি আমরা। সবরকম ক্যামিকেল সাপ্লাই দিয়েছি আমরা!"

"ক্যামিকেল সাপ্লাই দিয়েছেন আপনারা ?"

"হ্যাঁ। এই দেখেন সাতাইশ পৃষ্ঠায় আপনার সিগনেচার। আপনি প্রথম কনসাইনমেন্ট বুঝে নিয়েছেন। দুই লিটার একুয়া। এক হাজার গ্রাম সুকরোস আর পাঁচশ' গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড।"

মোটা গরম হয়ে বলল, "আপনি কী এটা অস্বীকার করতে পারেন ?"

অনিক কোন কথা না বলে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "একুয়া মানে হচ্ছে পানি, সুকরোস মানে গুড় আর সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে লবণ। এখন বুঝেছ, কেন দিয়েছিল ?"

আমি আবার লোহার রডটা নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম, অনিক অনেক কষ্ট করে আমাকে থামাল।

ঘণ্টাখানেকের মাঝে অনিকের বাসায় আক্কাস আকন্দের লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল। তারা অনিকের গবেষণার কাগজপত্র, মশার ঘর, মশা, মশার বাচ্চাকাচ্চা সব কিছু নিয়ে যেতে শুরু করল। বিশাল একটা ট্রাকে করে যখন সব কিছু তুলে নিয়ে চলে গেল তখন বাজে রাত এগারোটা চল্লিশ মিনিট। মোটা এবং চিকন হিসাব করে দেখেছে তারা অনিকের কাছে সাতশ' চল্লিশ টাকা পায়, অনিকের কাছে ছিল দুইশ' টাকা, আমি ধার দিলাম চল্লিশ টাকা। বাকি পাঁচশ' টাকার জন্যে তারা অনিকের বসার ঘরের দেয়াল থেকে তার দেয়াল ঘড়িটা খুলে নিয়ে চলে গেল।

সবাই যখন চলে গেল তখন আমি বললাম, "অনিক এখন আমার কথা বিশ্বাস হলো ?"

অনিক ভাঙা গলায় বলল, "কোন কথা ?"

"খোক্কস আকন্দ তোমার রক্ত-মাংস চুষে খাবে আর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে ?"

অনিক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "আজকে তোমার রক্ত-মাংস চুষে খেল। আর দুই একদিনের মাঝেই দেখবে তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানো শুরু করেছে।"

সত্যি সত্যি অনিকের চামড়া দিয়ে ডুগডুড়ি বাজানোর ব্যবস্থা হলো— এক সপ্তাহ পরে দেখলাম সব পত্রিকায় বড় বড় করে খবর ছাপা হয়েছে, 'মশা নিয়ন্ত্রণে যুগান্তকারী আবিষ্কার : আক্কাস আকন্দের নেতৃত্বে নতুন সম্ভাবনা।' নিচে ছোট ছোট করে লেখা আক্কাস আকন্দের ল্যাবরেটরিতে তার গবেষকরা কীভাবে দীর্ঘদিন রিসার্চ করে মশা নিয়ন্ত্রণের যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কার চুরি করার জন্য কীভাবে দুই দিকভ্রান্ত যুবক অপচেষ্টা করেছিল এবং কীভাবে তার সুযোগ্য আইনবিদরা সেই অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং এখন সেই আবিষ্কারের কথা কীভাবে দেশবাসীকে জানানোর জন্যে আক্কাস আকন্দের ল্যাবরেটরিতে একটা সংবাদ সম্মেলন করা হবে সেটা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সেই সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে সাথে উৎসাহী ছাত্র-শিক্ষক

এবং আমজনতাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। খবরটা পড়ে অনিক কেমন যেন মিইয়ে গেল। অনেক্ষণ গুম মেরে থেকে শেষে ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যাব।"

আমি বললাম, "কী বলেছ?"

"আমি বলেছি যে আমি যাব।"

আমি রেগেমেগে বললাম, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি দেখেছ খবরে লিখেছে দুইজন দিকভ্রান্ত যুবক এই আবিষ্কার চুরি করার অপচেষ্টা করেছিল?"

"দেখেছি।"

"তার মানে বুঝতে পারছ?"

"পারছি।"

"কী বুঝতে পারছ?"

"বুঝতে পারছি যে আমি গেলে আমাকে ধরিয়ে দেবে। অন্য সাংবাদিকদের বলবে এই সেই দিকভ্রান্ত যুবক।"

আমি বললাম, "তাহলে?"

"তবু আমি যাব।" অনিক মুখ গোঁজ করে বলল, "বদমাইশগুলো কী করে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। পরের দিন সব পত্রিকায় তোমার ছবি ছাপা হবে, নিচে লেখা হবে, এই সেই দিকভ্রান্ত যুবক যে যুগান্তকারী আবিষ্কার চুরি করার অপচেষ্টা করেছিল।"

অনিক ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হোক।"

আমি বললাম, "তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই বলবে এই সেই গবেষণা চোরা।"

অনিক বলল, "বলুক।"

আমি বললাম, "বাড়িওয়ালা তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে।"

অনিক বলল, "দিক।"

"এই এলাকায় কারও বাড়িতে চুরি হলে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। রিমান্ডে নিয়ে ইলেকট্রিক শক দিবে।"

অনিক বলল, "দিক।"

আমি বললাম, "কয়দিন আগে তুমি আমাকে বুঝিয়েছ সব কথাবার্তা কাজকর্ম হবে যুক্তিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক। এখন তুমি নিজে এরকম অযৌক্তিক কথা বলছ কেন? এরকম অবৈজ্ঞানিক কাজ করতে চাইছ কেন?"

অনিক ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বিজ্ঞানের খেতা পুড়ি।" অনিকের মুখ থেকে এরকম একটা কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম অবস্থা খুব জটিল। এখন তার সাথে ঝগড়া করে লাভ নাই। আমার বুকের ভেতরে তখন দুঃখ দুঃখ একটা ভাব ভুটভুট করতে থাকে। আমি বললাম, "ভাই অনিক।"

অনিক একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হলো!"

"আমিও যাব তোমার সাথে।"

"তুমিও যাবে?"

"হ্যাঁ। গিয়ে আমি যদি আক্কাস আকন্দের টুঁটি চেপে না ধরি, লাথি মেরে যদি তার সব এটর্নিদের হাঁটুর মালাই চাকি ফাটিয়ে না দিই তাহলে আমার নাম জাফর ইকবাল না।"

আমার কথা শুনে অনিক কেমন যেন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

পরের রোববার পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে আমি আর অনিক গুলশানের এক বিশাল দালানের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে বড় পোস্টার, 'মশা নিয়ন্ত্রণের যুগান্তকারী আবিষ্কার' সেখানে আক্কাস আকন্দের ছবি, শিকারির বেশে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে বন্দুক, সেই বন্দুক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার পায়ের কাছে একটা বিদঘুটে রাক্ষসের মতো মশা চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। দালানের সামনে মানুষের ভিড়, সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, টেলিভিশন চ্যানেলের লোকেরা টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। আক্কাস আকন্দের লোকেরা লাল রঙের ব্লেজার পরে ছোটাছুটি করছে। অনেক মানুষের ভিড়ের মাঝে আমি আর অনিকও ঢুকে পড়লাম। কেউ আমাদের লক্ষ্য করল না।

বড় একটা হলঘরের মাঝখানে অনিকের কাচঘর বসানো হয়েছে। ভেতরে লাখ লাখ মশা। মাঝে মাঝেই মশাগুলো খেপে উঠে গুঞ্জন করছে, তখন মনে হয় ঘরের মাঝে একটা জেট প্লেনের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠছে। ফটোসাংবাদিকরা ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কাচঘরের ছবি তুলছে। টেলিভিশন চ্যানেলের লোকজন ঘাড়ে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। সাধারণ দর্শকরাও এসেছে অনেক, তাদের কথাবার্তায় সারা ঘর সরগরম। আমি গোপনে পকেটে দুইটা পচা টমেটো নিয়ে এসেছি ঠিক করেছি আক্কাস আকন্দ আসামাত্র তার দিকে ছুড়ে মারব, তারপর যা থাকে কপালে তাই হবে। আমি মাঝে মাঝে চোখের কোণা দিয়ে অনিককে দেখছি, দেখে মনে হয় মরা মানুষের মুখ, তার মুখের দিকে তাকানো যায় না।

হঠাৎ করে ঘরের কথাবার্তা কমে এলো আমি তাকিয়ে দেখি খুব ব্যস্ততার ভান করে আক্কাস আকন্দের দুই এটর্নি মোটা-ফরসা-টাক-মাথা-গোঁফ আর চিকন-কালো-চুল এবং দাড়ি হনহন করে এগিয়ে আসছে। কাচঘরের সামনে দুইজন দাঁড়াল এবং সাথে সাথে ক্লিক ক্লিক করে সাংবাদিকরা তাদের ছবি তুলতে লাগল।

মোটা হাত তুলে সবাইকে চুপ করার ইঙ্গিত করতেই সবাই কথা বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল। মোটা বলল, "আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আজ অপনারা এখানে এসেছেন এক ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধিক্ষণে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষ দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক এবং দারিদ্র্যের সাথে যে জিনিসটির সাথে যুদ্ধ করে এসেছে সেটা হচ্ছে মশা। হ্যাঁ, মশা হচ্ছে মানবতার শত্রু। সভ্যতার শত্রু। দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির শত্রু।"

মোটা এই সময় থামল এবং চিকন কথা বলতে শুরু করল, গলা কাঁপিয়ে বলল, "সেই ভয়ঙ্কর শত্রুকে আমরা পরাভূত করেছি। আপনাদের ধারণা হতে পারে এই কাচঘরে আটকে রাখা লাখ লাখ মশা বুঝি ভয়ংকর কোন প্রাণী, সুযোগ পেলেই বুঝি আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে কামড়ে আপনার রক্ত শুষে নেবে! কিন্তু সেটি সত্যি নয়। মহামান্য আক্কাস আকন্দের সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের হাউজের বিজ্ঞানীরা এই ভয়ংকর মশাকে এক নিরীহ পতঙ্গে পরিণত করে দিয়েছেন। তারা আপনাকে কামড়াবে না, তারা আপনার রক্ত শুষে নেবে না।"

চিকন দম নেবার জন্য থামল, তখন মোটা আবার খেই ধরল, বলল, "আমি জানি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। আপনারা ভাবছেন এটা কেমন করে সম্ভব ? কিন্তু আমরা আপনাদের এটা দেখাব। এই কাচঘরে লাখ লাখ মশা। এরা হয়তো ম্যালেরিয়া-ফাইলেরিয়া বা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করছে। কেউ যদি এর ভেতরে ঢুকে তাহলে লাখ লাখ মশা এক মুহূর্তে তার সব রক্ত শুষে নিতে পারে— কিন্তু আমি আপনাদের বলছি তারা নেবে না।"

চিকন এবারে থামল, তখন মোটা বলল, "আছেন আপনাদের কেউ যে এর ভেতরে ঢুকবেন ? কারও সাহস আছে ?"

উপস্থিত সাংবাদিক দর্শক কেউ সাহস দেখাল না। মোটা হা হা করে হেসে বলল, "আমি জানি আপনাদের কেউ সেই সাহস করবেন না। তার প্রয়োজন নেই, কারণ এই কাচঘরে লাখ লাখ মশার ভেতরে ঢুকবেন আকন্দ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী মহামান্য আক্কাস আকন্দ স্বয়ং।"

মোটা নাটকীয়ভাবে কথা শেষ করতেই প্রথমে চিকন, তার সাথে সাথে লাল ব্লেজার্ড পরা আক্কাস আকন্দের লোকজন এবং তাদের দেখাদেখি সাংবাদিক দর্শকরা হাততালি দিতে শুরু করল।

ঠিক তখন আমরা দেখতে পেলাম হলঘরের অন্য মাথা থেকে আক্কাস আকন্দ হেঁটে হেঁটে আসছে। হাঁটার ভঙ্গিটা একটু অন্যরকম, মনে হয় টলতে টলতে আসছে, পাশেই একজন মাঝে মাঝে তাকে ধরে ফেলছে। একটু কাছে আসতেই দেখলাম তার চোখ ঢুলু ঢুল এবং মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি, শুধু নেশাগ্রস্ত মানুষেরা এভাবে হাসে। আমি পচা টমেটো দুইটা শক্ত করে ধরে রেখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললাম, "দেখছ ? শালা পুরোপুরি মাতাল!"

অনিক কেমন যেন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল, বলল, "কী বললে ?"

"বলেছি বেটা দিনদুপুরে মদ খেয়ে এসেছে!"

অনিক হঠাৎ আঁৎকে ওঠে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে শুরু করল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, সর্বনাশ।"

ঘরের সবাই ঘুরে অনিকের দিকে তাকাল। সারা ঘরে একটা কথা নাই। আক্কাস আকন্দ একটা হেঁচকি তুলে জড়িত গলায় বলল, "এই মক্কেলডারে এখানে কে এনেছে ?"

মোটা চিৎকার করে বলল, "ভলান্টিয়ার। একে বের করে দাও।"

চিকন ততক্ষণে আমাকেও দেখে ফেলেছে, সে খনখন গলায় বলল, "সাথে তার পার্টনারও আছে, তাকেও বের কর।"

অনিক দুই হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার কথা শুনেন—"

কিন্তু কেউ অনিকের কথা শুনতে রাজি হলো না, ফটো সাংবাদিকরা খ্যাচ খ্যাচ করে কিছু ছবি তুলে ফেলল এবং তার মাঝে লাল ব্লেজার্ড পরা লোকজন এসে আমাদের দুইজনকে গোল করে ঘিরে নিয়ে বের করে নিতে লাগল। আমি দুই হাতে দুইটা পচা টমেটো শুধু শুধু ধরে রাখলাম, আক্কাস আকন্দের দিকে ছুড়তে পারলাম না।

অনিক তখনও ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে এবং আক্কাস আকন্দের লোকজন আমাদের দুইজনকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাঝে দেখলাম কাচঘরের বাইরের একটা দরজা খোলা হলো। আক্কাস আকন্দ সেখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ভেতরে দ্বিতীয় দরজাটা খুলতেই সে লাখ লাখ মশার মাঝে হাজির হবে। অনিক

পাগলের মতো চিৎকার করছে, তার মাঝে আক্কাস আকন্দ দ্বিতীয় দরজাটা খুলে ফেলেছে।

তারপর যে ঘটনাটি ঘটল আমি আমার জীবনে কখনও সেরকম ঘটনা ঘটতে দেখিনি। হঠাৎ করে লাখ লাখ মশা একসাথে আক্কাস আকন্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল— আমরা তার গগনবিদারী চিৎকার শুনতে পেলাম! দেখলাম মশাগুলো কামড়ে তাকে তুলে ফেলেছে, শূন্যে সে লুটোপুটি খাচ্ছে, মশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে! তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে কালো কম্বল গায়ে দেয়া একটা ভালুক। বিকট চিৎকার করতে করতে সে হাত-পা ছুড়তে থাকে, তার মাঝে মশার ভয়ঙ্কর গুঞ্জন— সব মিলিয়ে একটা নারকীয় পরিবেশ। কাচঘরের ভেতরে মশাগুলো তাকে নাচিয়ে বেড়ায় এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে, ফুটবলের মতো ছুড়ে দেয়। ছাদে ঠেসে ধরে ঝপাং করে পানিতে ফেলে দিয়ে নাকানি-চুবানি খাওয়াতে থাকে। আক্কাস আকন্দের লোকজন কী করবে বুঝতে না পেরে দরজা খোলার চেষ্টা করতে থাকে এবং হঠাৎ করে সব মশা কাচঘর থেকে ভয়ঙ্কর গর্জন করে ছুটে বের হয়ে আসতে থাকে।

সাংবাদিক-দর্শকরা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে। এক দুইজন একটু ছবিও তুলেছিল কিন্তু যেই মুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে বন্যার পানির মতো কালো কুচকুচে মশার সমুদ্র বের হতে শুরু করল তখন সবাই প্রাণের ভয়ে ছুটতে শুরু করল। ঘরের ভেতরে যা একটা হুটোপুটি শুরু হলো সেটা বলার মতো নয়। আমি দেখলাম মশার দল আক্কাস আকন্দকে কামড়ে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে, সিঁড়ি দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল তারপর রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। মানুষজন প্রাণের ভয়ে ছুটছে। আমিও ছুটছিলাম, অনিক আমার হাত ধরে থামাল, বলল, "থাম। দৌড়ানোর দরকার নেই।"

"কী বলো দরকার নেই! খোক্কস আকন্দের অবস্থাটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ। বেটা মদ খেয়ে এসেছে সেই জন্যে! তুমি কী মদ খেয়েছ?"

"মদ?"

"হ্যাঁ। ইথাইল এলকোহল হচ্ছে মদ। এই মশা রক্ত না খেয়ে এখন মদ খাওয়া শিখেছে। আক্কাসের রক্তে ইথাইল এলকোহল, সেজন্যে ওকে ধরেছে।"

আমি বললাম, "আমাকে ধরবে না?"

"না। তুমি যদি ইথাইল এলকোহল— সোজা বাংলায় মদ খেয়ে না থাক তাহলে তোমাকে ধরবে না।"

আমি বললাম, "আমি মদ খেতে যাব কোন দুঃখে?"

"তাহলে তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ।" আমি তখন দেখলাম কালো মেঘের মতো লাখ লাখ মশা একসাথে ছুটে যাচ্ছে! সেটা একটা দেখার মতো দৃশ্য। না জানি এখন কোন মদ খাওয়া মানুষকে ধরবে। আমি বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মশাগুলো তখন দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হলো একটা মেঘ বুঝি ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন খবরের কাগজে খুব বড় বড় করে আক্কাস আকন্দের খবরটা ছাপা হয়েছিল। তার শরীরের ছিবড়েটা তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাকে নাকি দশ বোতল রক্ত দিতে হয়েছে! এতগুলো সাংবাদিককে ডেকে এনে এরকম ভাঁওতাবাজি করার জন্যে সাংবাদিকরা খুব ক্ষেপে পত্রিকাগুলোতে একেবারে যাচ্ছেতাইভাবে আক্কাস আকন্দকে গালাগাল করেছে। শুধু যে গালাগাল করেছে তা না, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নাকি এতগুলো মশা শহরে ছেড়ে দেবার জন্যে আক্কাস আকন্দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে দেবে। বাছাধনের বারোটা বেজে যাবে তখন।

পত্রিকার বড় বড় খবর নিয়ে সবাই যখন মাথা ঘামাচ্ছে তখন ভেতরের পাতার একটা খবর কেউ সেভাবে খেয়াল করেনি। এক রগচটা কাঠমোল্লা একটা গির্জা ঘেরাও করার জন্য তার দলবল নিয়ে রওনা দিয়েছিল, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে যখন সবাইকে উসকে দেবার জন্য গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে হাজার হাজার মশা এসে তাকে আক্রমণ করেছে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে সেই রগচটা কাঠ মোল্লা—

এত মানুষ থাকতে তাকেই কেন মশা আক্রমণ করল কেউ সেটা বুঝতে পারছে না।

বুঝতে পেরেছি খালি আমি আর অনিক!



ইঁদুর

ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে সেটা খোলা রেখেছি কিন্তু আর বেশিক্ষণ সেটা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত একশবার অনিককে বলেছি যে আমি বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না, খামখা আমাকে এসব বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নাই— কিন্তু বিষয়টা এখনো অনিকের মাথায় ঢোকাতে পারি নাই। যখনই তার মাথায় বিজ্ঞানের নতুন একটা আবিষ্কার কুটকুট করতে থাকে তখনই সেটা আমাকে শোনানোর চেষ্টা করে। আজকে যে রকম সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কালবৈশাখীর সময় যে বজ্রপাত হয় সেই বজ্রপাতের বিদ্যুৎটা কীভাবে ক্যাপাসিটর না কী এক বস্তুর মাঝে জমা করে রাখবে। বিষয়টা এক কান দিয়ে ঢুকে আমার অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। অনিক যেন সেটা বুঝতে না পারে সে জন্যে আমি চোখে-মুখে একটা কৌতূহলী ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছে আর পারা যাচ্ছে না। চোখে-মুখে কৌতূহলী ভাব নিয়েই মনে হয় আমি ঘুমে ঢলে পড়ব।

আমার কপাল ভাল, ঠিক এরকম সময় অনিক থেমে গিয়ে বলল, "এক কাপ চা খেলে কেমন হয়?"

আমি হাতে দিয়ে বললাম, "ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া?"

"রং চা খেতে হবে কিন্তু।" অনিক বলল, "বাসায় দুধ নাই।"

আমি বললাম, "রং চাই ভাল।"

অনিক একটু ইতস্তত করে বলল, "চিনিও মনে হয় নাই। খোঁজাখুঁজি করে একটা ক্যামিকেল বের করতে পারি যেটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হতে পারে—"

চিনি নাই শুনে আমি একটু দমে গেলাম কিন্তু তাই বলে কোন একটা ক্যামিকেল খেতে রাজি হলাম না। বললাম, "কিছু দরকার নেই চিনির। চিনি ছাড়াই চা খাব।"

অনিক তার রান্নাঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ খুটুর মুটুর শব্দ করে বাইরে এসে বলল, "চা পাতাও তো দেখি নাই। খালি গরম পানি খাবে, জাফর ইকবাল?"

এবারে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। বললাম, "তার চাইতে চলো মোড়ের দোকান থেকে চা খেয়ে আসি।"

অনিক বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না। তাহলে চায়ের সাথে অন্য কিছুও খাওয়া যাবে।"

তাই আমি আর অনিক বাসা থেকে বের হলাম। অনিকের বাসার রাস্তা পার হয়ে মোড়ে ছোট একটা চায়ের দোকান, সময়-অসময় নেই সব সময়েই এখানে মানুষের ভিড়। আমরা দুইজন খুঁজে একটা খালি টেবিল বের করে বসে চায়ের অর্ডার দিয়েছি। অনিক টেবিল থেকে পুরনো একটা খবরের কাগজ তুলে সেখানে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "চা একটা অদ্ভুত জিনিস! কোথাকার কোন গাছের পাতা শুকিয়ে সেটা গরম পানিতে দিয়ে রং করে সেটাতে দুধ চিনি দিয়ে মানুষ খায়। কী আশ্চর্য!"

আমি বললাম, "মানুষ খায় না এমন জিনিস আছে? কোন দিন চিন্তা করেছ জন্তু-জানোয়ারের নিচে লটরপটর করে ঝুলে থাকে যেসব জিনিস সেটা টিপে যে রস বের হয় সেটা খায়?"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সেটা আবার কী?"

"দুধ! গরুর দুধ!"

অনিক হা হা করে বলল, "সে ভাবে চিন্তা করলে মধু জিনিসটা কী কখনো চিন্তা করেছ? পোকা মাকড়ের পেট থেকে বের হওয়া আঠা আঠা তরল পদার্থ।"

আমি আরেকটা কী বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন পাশের টেবিল থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি কমবয়সী মাস্তান ধরনের একজন একটা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিৎকার করছে। তার সামনে রেস্টুরেন্টের বয় ছেলেটি ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাস্তান হুংকার দিয়ে বলল, "তোরে আমি কতবার কইছি চায়ে চিনি কম?"

ছেলেটি ভয়ে কোন কথা বলল না। মাস্তান টেবিলে কিল দিয়ে বলল, "আর তুই হারামির বাচ্চা শরবত বানায় আনছস? আমার সাথে রংবাজি করস?"

টেবিলে তার সামনে বসে থাকা আরেকজন মাস্তান সমান জোরে হুংকার দিয়ে বলল, "কথা বাড়ায়া লাভ নাই বিল্লাল ভাই। হারামজাদার মাথায় ঢালেন। শিক্ষা হউক—"

প্রথম মাস্তান, যার নাম সম্ভবত বিল্লাল মনে হলো প্রস্তাবটা শুনে খুশি হলো। মাথা নেড়ে বলল, "কথা তুই মন্দ বলিস নাই।" তারপর রেস্টুরেন্টের বয়



ছেলেটার শার্টের কলার ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এসে কাপটা তার মাথার ওপর ধরল। চায়ের কাপটা থেকে গরম চা মনে হয় সত্যি ঢেলেই দিত কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে অনিক লাফিয়ে চায়ের কাপটা ধরে ফেলল। মাস্তানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মাথা খারাপ হয়েছে?"

বিল্লাল মাস্তান একটু অবাক হয়ে অনিকের দিকে তাকাল। বলল, "আপনে কেডা?"

অনিক বলল, "আমি যেই হই না কেন— তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি একটি ছোট বাচ্চার মাথায় গরম চা ঢালতে পারেন না।"

দুই নম্বর মাস্তান বলল, "আপনি দেখবার চান আমরা সেটা পারি কী না?"

অনিক বলল, "না সেটা দেখতে চাই না। আপনার চায়ে যদি চিনি বেশি হয়ে থাকে আপনাকে আরেক কাপ চা বানিয়ে দেবে কিন্তু সে জন্যে আপনি একটা ছোট বাচ্চার মাথায় গরম চা ঢালবেন?"

এরকম সময় রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার দুই কাপ চা, সিঙ্গাড়া আর কয়েকটা মোগলাই পরটা নিজের হাতে করে টেবিলে নিয়ে এসে বলল, "বিল্লাল ভাই এই যে আপনার জন্যে এনেছি। রাগ করবেন না বিল্লাল ভাই। খান। খেয়ে বলেন কেমন হইছে।"

বিল্লাল নামের মাস্তানটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি কী রাগ করতে চাই? কিন্তু আপনার বেয়াদব বেয়াক্কেল বয় বেয়ারা—"

ম্যানেজার বলল, "ছোট মানুষ বুঝে নাই। আর ভুল হবে না বিল্লাল ভাই।" তারপর ছোট ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলল, "যা এখান থেকে।"

দুইজন মাস্তান তখন খুব তৃপ্তি করে খেতে থাকে। খেতে খেতে দুলে দুলে হাসে যেন খুব মজা হয়েছে। দেখে আমার রাগে পিত্তি জ্বলে যায়।

মাস্তান দুইজন যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ রেস্টুরেন্টের কেউ কোন কথা বলল না। কিন্তু তারা খেয়ে বিল শোধ না করে বের হওয়া মাত্রই সবাই কথা বলতে শুরু করল। ম্যানেজার নিচে থুথু ফেলে বলল, "আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক তোদের ওপর। মাথার ওপর ঠাঠা পড়ুক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কারা এরা?"

"আর বলবেন না। বারো নম্বর বাসায় উঠেছে। দুই মাস্তান। একজন বিল্লাল আরেকজন কাদির। মাস্তানীর জ্বালায় আমাদের জান শেষ।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "এরকম মানুষকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিল কেন?"

ম্যানেজার বলল, "বাড়ি ভাড়া দিয়েছে মনে করেছেন? জোর করে ঢুকে গেছে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "জোর করে ঢুকে গেছে ?"

"জে।" ম্যানেজার শুকনো মুখে বলল "বারো নম্বর বাসাটা হচ্ছে মাসুদ সাহেবের। রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার। অনেক কষ্ট করে দোতলা একটা বাসা করেছেন। নিচের তলা ভাড়া দিয়েছেন উপরে নিজে থাকতেন। কয়দিন আগে হার্ট এটাকে মারা গেলেন। তার স্ত্রী বুড়ি মানুষ কিছু বুঝেন-সুঝেন না। সাদাসিধে মানুষ। তখন এই দুই মাস্তান ভাড়াটেদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে ঢুকে গেল।"

রেস্টুরেন্টের একজন বলল, "পুরো বাড়ি দখলের মতলব।"

ম্যানেজার মাথা নাড়ল, "জে। বুড়ির কিছু হইলেই তারা বাড়ি দখল করে নিবে।"

রেস্টুরেন্টের একজন বলল, "কিছু না হইলেও দখল নিবে। এরা লোক খুব খারাপ।"

ম্যানেজার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "জে। বাসায় মদগাঞ্জা ফেন্সিডিল ছাড়া কোন ব্যাপার নাই। এলাকার পরিবেশটা নষ্ট করে দিল।"

রেস্টুরেন্টে যারা চা খাচ্ছে তারাও এই এলাকাটা কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল। দেখা গেল সবারই বলার মতো ছোট বড় কোন একটা গল্প আছে।

আমরা চা খেয়ে বের হয়ে বাসায় ফেরত আসছি তখন রাস্তার পাশে হঠাৎ করে অনিক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "বারো নম্বর বাসা।"

আমিও ভাল করে তাকালাম, জরাজীর্ণ দোতলা একটা বাসা। দেখেই বোঝা যায় কোন রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার তার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে কোনভাবে দাঁড়া করিয়েছেন। বহুদিনের পুরনো, দরজা-জানালার রঙ উঠে বিবর্ণ। প্যানেস্তারা খসে জায়গায় জায়গায় ইট বের হয়ে এসেছে। নিচের তলায় দরজায় তালা মারা, এখানে নিশ্চয়ই বিল্লাল এবং কাদির মাস্তান থাকে। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে দেখা যায়, সেখানে মোটামুটি একটা হতচ্ছাড়া পরিবেশ।

আমরা ঠিক যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন দোতলা থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। মহিলার গলার আওয়াজ মনে হলো, কেউ বুঝি কাউকে খুন করে ফেলছে। আমি আর অনিক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম, দরজা বন্ধ। সেখানে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললাম, "কী হয়েছে ?"

আমাদের গলার আওয়াজ শুনে ভিতরের চিৎকার হঠাৎ করে থেমে গেল। আমরা আবার দরজায় ধাক্কা দিলাম। তখন ভিতর থেকে ভয় পাওয়া গলায় একজন বলল, "কে ?"

অনিক বলল, "আমরা। কোন ভয় নাই দরজা খুলেন।"

তখন খুট করে শব্দ করে দরজা খুলে গেল। বারো-তেরো বছর বয়সের একটা মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় বাসায় কাজকর্মে সাহায্য করে। পিছনে একটা চেয়ারের ওপরে সাদা চুলের একজন বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। মনে হয় এই বুড়ি মহিলাটিই চিৎকার করেছিল। অনিক জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ?"

বারো-তেরো বছরের মেয়েটি খুক খুক করে হেসে ফেলল। বলল, "নানু ভয় পাইছে।"

"কী দেখে ভয় পেয়েছেন ?"

"ইন্দুর।"

ব্যাপারটা এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো। যারা ইঁদুরকে ভয় পায় তারা ইঁদুর দেখে লাফিয়ে চেয়ার-টেবিলে উঠে পড়তেই পারে। ভয় খুব মারাত্মক জিনিস। গোবদা একটা মাকড়সা দেখে আমি একবার চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

অনিক বুড়ি মহিলার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি নামুন। কোন ভয় নাই।"

বুড়ি মহিলা অনিকের হাতে ধরে সাবধানে নামতে নামতে রাগে গরগর করতে করতে বলল, "এত করে শিউলিরে বললাম ইঁদুর মারার বিষ কিনে আন, আমার কথা শুনতেই চায় না—"

শিউলি নিশ্চয়ই কাজের মেয়েটি হবে, সে দাঁত বের করে হেসে বলল, "আনছি নানু। কিন্তু বিষে ভেজাল আমি কী করমু ? সেটা খেয়ে ইন্দুরের তেজ আরও বাড়ছে। গায়ে জোর আরও বেশি হইছে।"

বুড়ি ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঢং করিস না! ইঁদুরের বিষে আবার ভেজাল হয় কোন দিন শুনছিস ?"

শিউলি বলল, "হয় নানু হয়। আজকাল সবকিছুতে ভেজাল। সব কিছুতে দুই নম্বুরি।"

অনিক হাসি হাসি মুখে বলল, "আপনাকে যদি ইঁদুরে উৎপাত করে কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সব ইঁদুর দূর করে দিব!"

বুড়ি এবারে ভাল করে একবার অনিকের দিকে আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কে বাবা ?"

অনিক বলল, "আমি এই পাড়াতেই থাকি।"

"তোমার কাছে ভাল ইঁদুরের বিষ আছে ?"

"জি না, বিষ নেই। তবে আমি আপনার এখানে লো ফ্রিকুয়েন্সির কয়েকটা সোনিক বিপার লাগিয়ে দেব, ইঁদুর বাপ বাপ করে পালিয়ে যাবে।"

"কী লাগিয়ে দেবে ?"

"সোনিক বিপার। তার মনে হচ্ছে মেকানিক্যাল অসিলেশান। আমাদের কানের রেসপন্স হচ্ছে বিশ হার্টজ থেকে বিশ কিলো হার্টজ। এই বিপার—"

আমি অনিকের হাত ধরে বললাম, "এত ডিটেলসে বলার কোন দরকার নেই। তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। শুধু কী করতে হবে বলে দাও—"

"কিছু করতে হবে না, ঘরের কোন এক জায়গায় রেখে দেবেন, দেখবেন পাঁচ-দশ মিটারের ভেতর কোন ইঁদুর আসবে না। যদি থাকে বাপ বাপ করে পালাবে।"

বুড়ি ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা, মাস্তানদের জন্যে এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারবে না ? যেটা লাগালে মাস্তানেরা বাপ বাপ করে পালাবে ?"

শিউলি আবার হি হি করে হেসে উঠে বলল, "নানু, মাস্তানরা ইন্দুর থেকে অনেক বেশি খারাপ! তারা একবার বাড়িতে ঢুকলে কোন যন্ত্র দিয়ে বের করা যায় না!"

অনিক কোন কথা বলল না, একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "প্রথমে ইঁদুর দিয়ে শুরু করি। আজকে হয়তো পারব না, কাল না হয় পরশু বিকেলে আমি আসব। এসে সনিক বিপারগুলো লাগিয়ে দেব।"

বৃদ্ধা মহিলা বললেন, "ঠিক আছে বাবা।"

বাসায় ফিরে অনিক কাজ শুরু করে দিল। তার ওয়ার্কবেঞ্চে নানা যন্ত্রপাতি ইলেকট্রনিক সার্কিট একত্র করে কী যেন একটা তৈরি করতে লাগল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "ইঁদুরের জন্যে এত যন্ত্রপাতি লাগে ? আমি দেখেছি আমার মা ভাতের সাথে সেঁকো বিষ মিশিয়ে রান্নাঘরের কোণায় ফেলে রাখতেন—"

অনিক বলল, "শুধু ইঁদুর দূর করতে এত জিনিস লাগে না। আমি এই বাড়ি থেকে ছোট ইঁদুর আর বড় ইঁদুর সব দূর করতে চাই!"

"বড় ইঁদুর ?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কত বড় ?"

অনিক হাত তুলে বলল "এই এত বড়!"

"এত বড় ইঁদুর হয় ?"

অনিক বলল, "হয়।"

আমি তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম অনিক বিল্লাল আর কাদিরের কথা বলছে। আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "পারবে দূর করতে ?"

অনিক গম্ভীর মুখে বলল, "দেখি।"

আমি অনিককে কাজ করতে দিয়ে বাসায় চলে এলাম।

দু'দিন পর বিকাল বেলা অনিক আমাকে ফোন করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ইঁদুর দূর করার যন্ত্র কতদূর ?"

"রেডি।"

"ছোট ইঁদুর না বড় ইঁদুর ?"

"দুটোই।"

"ভেরি গুড। কখন যন্ত্রগুলো লাগাতে যাবে ?"

"এখনই যাব ভাবছিলাম। তোমার কোন কাজ না থাকলে চলে এসো।"

খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া আমার আর কখনোই কোন কাজ থাকে না। আমি তাই সাথে সাথে রওনা দিয়ে দিলাম।

অনিকের বাসায় গিয়ে দেখি সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, "চলো যাই।"

আমি বললাম, "চলো।"

"আসার সময় বারো নম্বর বাসাটা লক্ষ্য করেছ ?"

"হ্যাঁ। করেছি। কেন ?"

"বড় ইঁদুর দুটি আছে ?"

"কে ? বিল্লাল আর কাদির ?"

"হ্যাঁ।"

"ঘরে তালা নেই। নিশ্চয়ই আছে।"

অনিক সন্তুষ্টির ভাব করে বলল, "গুড।"

দুইজন মাস্তান বাসায় থাকলে কেন সেটা ভাল হবে আমি সেটা বুঝতে পারলাম না, পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিসই আমি অবশ্যি বুঝতে পারি না, তাই আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

বারো নাম্বার বাসায় গিয়ে আমি আর অনিক যখন ধুপধাপ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি তখন নিচের তলার দরজা খুলে একজন মাস্তান বের হয়ে এলো। আমরা চিনতে পারলাম, এটা বিল্লাল মাস্তান। আমাদের দিকে ভুরু কুচকে তাকিয়ে বিল্লাল মাস্তান বলল, "কে ? আপনারা কোথায় যান ?"

"উপর তলায়।"

"কেন ?"

আমাদের ইচ্ছে হলে আমরা উপর তলা-নিচের তলা যেখানে খুশি যেতে পারি, মাস্তানের তাতে নাক গলানোর কি ? আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, অনিক আমাকে থামিয়ে বলল, "উপর তলায় খুব ইঁদুরের উৎপাত তাই একটা যন্ত্র লাগাতে যাচ্ছি।"

বিল্লাল মাস্তান তখন হঠাৎ করে আমাদের দুইজনকে চিনতে পারল, চোখ বড় করে বলল, "আপনাদের আগে দেখেছি না ?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ। চায়ের দোকানে—"

"বেয়াদব ছেমড়াটা যখন ডিস্টার্ব করছিল আর আমি যখন টাইট দিতে যাচ্ছিলাম তখন—"

অনিক মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। তখন আমি আপনাকে থামিয়েছিলাম।"

বিল্লাল মাস্তান গম্ভীর মুখে বলল, "উচিত হয় নাই। বেয়াদব পোলাটার একটা শাস্তি হওয়া দরকার ছিল।"

আমি আর অনিক কোন কথা বললাম না। কে সত্যিকারের বেয়াদব আর কার শাস্তি হওয়া দরকার সে ব্যাপারে আমার আর অনিকের ভেতরে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি তখন বিল্লাল মাস্তান পিছু পিছু উঠে এলো। বলল, "আমাদের ঘরেও ইন্দুরের উৎপাত। শালার রাত্রে ঘুমানো যায় না। আমাদের ঘরেও একটা যন্ত্র লাগায়ে দিবেন!"

"এইগুলি দামি যন্ত্র।"

"কত দাম ?"

"টাকা দিয়ে তো আর দাম বলতে পারব না। অনেক গবেষণা করে বানাতে হবে। আমার কাছে বেশি নাই। একটাই আছে।"

"অ।" বিল্লাল কেমন যেন বিরস মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর অনিক দোতালায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিলাম। শিউলি দরজা খুলে আমাদের দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, "নানু ইন্দুরওয়ালারা আসছে।"

আমি আর অনিক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। এই বাসায় আমাদের যে ইন্দুরওয়ালা হিসেবে একটা পরিচিতি হয়েছে সেটা জানতাম না। শিউলি যখন আমাদের পিছনে বিল্লাল মাস্তানকে দেখল তখন দপ করে তার মুখের হাসি নিভে গেল।

অনিক তার ব্যাগ থেকে গোলাকার একটা যন্ত্র বের করে বলল, "এটা একটা উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। এমনভাবে রাখতে হবে যেন সম্পূর্ণ ঘরটা সামনে থাকে। সামনে কিছু থাকলে কিন্তু কাজ করবে না।"

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা বললেন, "ঐ আলমারির ওপর রেখে দেন।"

অনিক আলমারীর ওপর রেখে সুইচ টিপে সেটা অন করে দিতেই একটা ছোট লাল বাতি জ্বলতে থাকল। অনিক সন্তুষ্টির ভান করে বলল, "গুড। এখন আর কোন চিন্তা নেই। আপনার এই ঘরে কোন ইঁদুর ঢুকবে না।"

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা খানিকটা সন্দেহের চোখে যন্ত্রটা দেখে বললেন, "দেখি বাবা, তোমার যন্ত্র কাজ করে কিনা।"

অনিক একটা কাগজ বের করে সেখানে তার নাম-ঠিকানা লিখে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে বলল, "যদি কোন সমস্যা হয় শিউলিকে দিয়ে আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দেবেন। আমি এই এক রাস্তা পরেই থাকি।"

"ঠিক আছে বাবা।"

আমরা যখন বের হয়ে এলাম তখন বিল্লাল মাস্তান আমাদের সাথে বের হয়ে এলো। কিন্তু আমাদের সাথে নিচে নেমে এলো না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে বগল চুলকাতে লাগলো।

রাস্তায় নেমে আমি বললাম, "একটা বোকার মতো কাজ করেছ।"

"কী করেছি বোকার মতো ?"

"এই যে বিল্লাল মাস্তানকে ইঁদুর দূর করার যন্ত্রটা দেখালে। এই মাস্তান তো এই যন্ত্র কেড়ে নিয়ে যাবে।"

অনিক আনন্দিত মুখে বলল, "তোমার তাই মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ।"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "দেখা যাক কী হয়।"

অনিক বাসায় এসেই আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। অনেক যন্ত্রপাতির মাঝে একটা বড় টেলিভিশন, সুইচ টিপে সেটা অন করে দিয়ে সামনে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হলো ? এখন টেলিভিশন দেখবে ?"

"হ্যাঁ।"

"বাংলা সিনেমা আছে নাকি ?"

"দেখি বাংলা নাকি ইংরেজি।"

টেলিভিশনটা হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সেখানে আমি একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম; স্ক্রিনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বারো নম্বর বাসার বৃদ্ধা মহিলা এবং শিউলিকে। দুজনের চোখে-মুখে একটা ভয়ের ছাপ, কারণ কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বিল্লাল মাস্তান। অনিক ভলিউমটা বাড়াতেই আমি তাদের কথাও শুনতে পেলাম। শিউলি বলছে, "না এইটা নিয়েন না। এইটা ইন্দুরওয়ালারা নানুরে দিছে।"

বিল্লাল মাস্তান হাত তুলে বলল, "চড় মেরে দাঁত ফেলে দিব। আমার মুখের উপরে কথা ?"

আমি অবাক হয়ে অনিকের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হচ্ছে এখানে ?"

অনিক দাঁত বের করে হেসে বলল, "যে যন্ত্রটা রেখে এসেছি সেটা আসলে একটা ছোট ভিডিও ট্রান্সমিটার। সাথে আল্ট্রাসনিক একটা ইন্টার ফেসও আছে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে এটা যেখানে থাকবে সেটা আমরা দেখতে পাব। সেখানকার কথা শুনতে পাব।"

আমি দেখতে পেলাম বিল্লাল মাস্তান হাত বাড়িয়ে টেলিভিশনে এগিয়ে আসছে এবং হঠাৎ করে ছবি ওলটপালট হতে লাগল। অনিক দাঁত বের করে হেসে বলল, "বিল্লাল মাস্তান আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে।"

"মানে ?"

"এখন বিল্লাল মাস্তান এই ভিডিও ট্রান্সমিটার তার ঘরে নিয়ে রাখবে। আমরা এখানে বসে দেখব ব্যাটা বদমাইশ কখন কী করে ?"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি জানতে যে বিল্লাল মাস্তান এটা নিয়ে যাবে ?"

"আন্দাজ করেছিলাম।"

"এটা আসলে তাহলে ইঁদুর দূর করার যন্ত্র না ?"

"ইঁদুর ধরার সিগন্যালও এটা দিতে পারে তবে, আসলে এটা একটা ভিডিও ট্রান্সমিটার।"

অনিক টেবিলে ছোট ছোট চৌকোণা প্লাস্টিকের কয়েকটা বাক্স দেখিয়ে বলল, "এইগুলো হচ্ছে আসল ইঁদুর দূর করার যন্ত্র। ইনফ্রাসনিক স্পিকার।"

"তাহলে ?" পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল মনে হতে থাকে, "এগুলো দিলে না কেন ?"

"দিব। একটু পরে যখন শিউলি আমাদের কাছে নালিশ করতে আসবে তখন তার হাতে দিব।" অনিক টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তেজিত গলায় বলল, "দেখ দেখ মজা দেখ।"

স্ক্রিনে দৃশ্যটা ওলটপালট খেতে খেতে হঠাৎ সেটা সোজা হয়ে গেল এবং আমরা বিল্লাল মাস্তানকে দেখতে পেলাম। সে ভিডিও ট্রান্সমিটারের সামনে থেকে সরে যেতেই পুরো ঘরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘরের এক কোণায় একজন উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে, নিশ্চয়ই এটা কাদির। আমাদের ধারণা সত্যি কারণ বিল্লাল মাস্তান কাছে গিয়ে তাকে একটা লাথি মারতেই সে ধরমর করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, "কী হলো বিল্লাল ভাই ?"

বিল্লাল মাস্তান আঙুল দিয়ে ভিডিও ট্রান্সমিটারটাকে দেখিয়ে বলল, "আর ইন্দুর নিয়া চিন্তা নাই। ইন্দুর দূর করার যন্ত্র নিয়া আসছি।"

"কোথা থেকে আনলেন ?"

"উপর তলার বুড়িরে দুই বেকুব দিয়ে গেছে।"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখেছ কত বড় সাহস ? আমাদের বেকুব বলে ?"

"বলতে দাও। দেখা যাক কে বেকুব। আমরা না তারা।"

আমরা দেখলাম বিল্লাল মাস্তান সোফায় বসে সোফার নিচে থেকে একটা বোতল বের করে সেটা ঢক ঢক করে খেতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খাচ্ছে ?"

"ফেন্সিডিল।"

"কত বড় বদমাইশ দেখেছ ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন পুলিশকে খবর দিলে কেমন হয় ?"

অনিক বলল, "এত তাড়াহুড়া কিসের ? দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়।"

টেলিভিশন স্ক্রিনে আমরা দুই মাস্তানের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিল্লাল কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এই বুড়ি খুব তাড়াতাড়ি মরবে বলে তো মনে হয় না।"

কাদির বলল, "সিঁড়ির ওপর থেকে ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দেই একদিন ?"

"উঁহু।" বিল্লাল আরেক ঢোক ফেন্সিডিল খেয়ে বলল, "এমন ভাবে মার্ডার করতে হবে যেন কেউ সন্দেহ না করে। কোন তাড়াহুড়া নাই।"

অনিক হা হা করে হেসে বলল, "দেখেছ ? আমাদের যে রকম তাড়াহুড়া নাই, তাদেরও কোন তাড়াহুড়া নাই।"

ঠিক এরকম সময় দরজায় শব্দ হলো। অনিক টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই শিউলি এসেছে।"

দরজা খুলে দেখি আসলেই তাই। আমাদের দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "সর্বনাশ হইছে চাচা—"

"কী হয়েছে ?"

"নিচের তলার মাস্তান আপনার যন্ত্র জোর করে নিয়ে গেছে।"

আমি এবং অনিক অবাক এবং রাগ হবার অভিনয় করতে থাকি। শিউলি পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে এবং আমরা যেখানে যতটুকু দরকার সেখানে ততটুকু মাথা নাড়তে থাকি।

শিউলির কথা শেষ হবার পর অনিক বলল, "তোমার ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। আমার কাছে আরও ইঁদুর দূর করার যন্ত্র আছে।"

অনিক একটা ব্যাগে চৌকোণা প্লাস্টিকের বাক্সগুলো ভরে শিউলির হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো সব ঘরে একটা করে রেখে দিও ইঁদুর আর আসবে না।"

শিউলি খুশি খুশি মুখে বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ।" অনিক গলা নামিয়ে বলল, "সাবধান, বিল্লাল মাস্তান যেন এগুলোর খোঁজ না পায়।"

"পাবে না চাচা। আমি লুকিয়ে নিয়ে যাব।"

"গুড।" অনিক টেবিল থেকে আরেকটা প্যাকেট বের করে দিয়ে বলল, "এইটাও সাথে রাখ।"

"এইটা কী ?"

"ইঁদুরের খাবার। বাসার বাইরে যেখানে ইঁদুর থাকে সেখানে এইগুলো রাখবে।"

শিউলি বলল, "এইটা কী বিষ ?"

অনিক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, "অনেকটা সে রকম। সাবধান হাত দিয়ে ধরো না। হাতে লাগলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।"

"ঠিক আছে। আমি এখন যাই।"

"যাও শিউলি।"

শিউলি চলে যাবার পর আমি বললাম, "এইটুকুন ছোট একটা বাচ্চার হাতে ইঁদুর মারার বিষ দেওয়া কী ঠিক হলো ?"

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি মোটেও ওর হাতে বিষ দেই নাই।"

"তাহলে কী দিয়েছ ?"

"গ্রোথ হরমোন মেশানো খাবার!"

"মানে ?"

"মানে বারো নম্বর বাসায় যত ইঁদুর আছে সেগুলিকে মোটাতাজা করছি!"

"মোটাতাজা ?"

"হ্যাঁ। ইনফ্রাসনিক বিপারের কারণে এখন বাসার ভেতরে কোন ইঁদুর ঢুকবে না, কিন্তু সেগুলো আস্তে আস্তে খাসির মতো মোটা হবে। তারপর যখন সময় হবে তখন—"

"তখন কী ?"

"তখন বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তান বুঝবে কত ইঁদুরের দাঁতের মাঝে কত ধার।"

আমি অনিকের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। অনিক চোখ মটকে বলল, "চল, আরও কিছুক্ষণ বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের নাটক দেখি।"

আমরা গিয়ে টেলিভিশন অন করতেই, দুইজনকে দেখতে পেলাম খালি গায়ে টেলিভিশনে হিন্দি সিনেমা দেখে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। দুইজনের হাতে ছোট ছোট দুইটা বোতল, সেটা চুমুক দিয়ে খাচ্ছে, আর ঢেঁকুর তুলছে, কী বিচ্ছিরি একটা দৃশ্য!

কয়েকদিন পরের কথা, আমি অনিকের বাসায় গিয়েছি। দুইজনে চিপস খেতে খেতে টেলিভিশনে বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের কাজ কারবার দেখছি। এখানে যেসব জিনিস আমরা দেখতে পেয়েছি পুলিশ সেটা জানলেই একেক জনের চৌদ্দ বছর করে জেল হবার কথা। মদ গাঁজা ভাং থেকে শুরু করে হেরোইন ফেন্সিডিল সব কিছু নিয়ে তাদের কাজ কারবার। নানা রকম বেআইনি অস্ত্রপাতিও ঘরের মাঝে লুকানো থাকে। সেগুলো ব্যবহার করে কবে কোথায় কোন ছিনতাই করেছে, কোন মাস্তানি করেছে অনিক সেই সংক্রান্ত সব কথাবার্তা রেকর্ড করে ফেলেছে। বেছে বেছে সেসব জায়গা কপি করে একটা সিডি তৈরি করে পুলিশকে একটা আর খবরের কাগজের লোকদের একটা দিলেই বাছাধনদের শুধু বারোটা না, একেবারে বারো দুগুণে চব্বিশটা বেজে যাবে। কীভাবে সেটা করা যায় আমি আর অনিক সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। এরকম সময় অনিক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "ঐ যে শিউলি যাচ্ছে!"

আমি বললাম, "ডাকো ওকে, একটু খোঁজখবর নেই।"

অনিক জানালা দিয়ে মাথা বের করে ডাকল, "শিউলি!"

শিউলি আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ছুটে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর শিউলি ?"

"ভাল।"

"কোথায় যাও ?"

"বাজার করতে যাই।"

অনিক জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাসায় ইঁদুরের উৎপাত কমেছে ?"

"জে কমেছে। বাসায় ইন্দুরের বংশই নাই।"

"তাই নাকি ?"

"জে। নানু খুব খুশি। প্রত্যেকদিন আপনাদের কথা কয়।"

"কী বলেন আমাদের কথা ?"

"বলেন যে যদি ইন্দুরের যন্ত্রের মতো আরেকটা যন্ত্র বানাতে পারতেন যেটা মাস্তানদের দূর করতে পারে তাহলে খুব মজা হতো।"

অনিক কিছু না বলে একটু হাসল। শিউলি বলল, "নানু আপনাদের একদিন চা নাস্তা খেতে ডাকবে।"

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, "ভেরি গুড। ভেরি গুড।"

অনিক বলল, "ঠিক আছে শিউলি তুমি তাহলে তোমার কাজে যাও।"

শিউলি চলে যেতে শুরু করে। অনিক পেছন থেকে বলল, "তোমাদের অন্য কোন সমস্যা হলে আমাকে বলো।"

"কোন সমস্যা নাই।" শিউলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে বলল, "শুধু একটা সমস্যা।"

"অনিক অবাক হয়ে বলল, "কী সমস্যা?"

"এখন ইন্দুরের কোন উৎপাত নাই কিন্তু বিলাইয়ের উৎপাত বাড়ছে।"

"বিড়ালের উৎপাত বেড়েছে?" অনিক অবাক হয়ে বলল, "বিড়াল কোথা থেকে এসেছে?"

"সেইটা জানি না। তয় নানু বিড়ালরে একদম ডরায় না, সেই জন্যে নানু কিছু বলে না। উল্টা প্লেটে করে প্রত্যেক দিন খাবার দেয়।"

অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "কী রকম বিড়াল?"

"সেইটা দেখি নাই। রাত্রি বেলা আসে তাই দেখা যায় না।"

"রাত্রি বেলা আসে?"

"জে।"

"ডাকাডাকি করে?"

শিউলি মাথা চুলকে বলল, "জে না ডাকাডাকি করে না।

"তাহলে কেমন করে বুঝলে এটা বিড়াল। দেখতেও পাও না ডাকও শোন না—"

"ওপর থেকে নিচে তাকালে দেখা যায়। আবছা অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি করে। বিলাইয়ের সাইজ।"

অনিক হঠাৎ কেমন জানি চিন্তিত হয়ে গেল। শিউলি চলে যাবার পরও সে গম্ভীর মুখে হাঁটাহাঁটি করে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে অনিক?"

"শুনলে না—ইঁদুরের উৎপাত কমেছে, কিন্তু বিড়ালের উৎপাত বেড়েছে।"

"বিড়ালকে যদি উৎপাত মনে না করে—"

"না-না-না" অনিক দ্রুত মাথা নাড়ে, "তুমি কিছু বুঝতে পারছ না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী বুঝতে পারছি না?"

"এগুলো বিড়াল না।"

"তাহলে এগুলো কী?"

"এগুলি ইঁদুর। আমার গ্রোথ হরমোন খাবার খেয়ে বড় হয়ে গেছে।"

"কত বড় হয়েছে?"

"শুনলে না শিউলি বলল, বিড়ালের সাইজ!"

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "একেকটা ইঁদুরের সাইজ বিড়ালের মতো? সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ, সর্বনাশ। ডজন খানেক এই ইঁদুর যদি কাউকে ধরে তাহলে তার খবর আছে।"

আমি অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি এগুলোকে এত বড় তৈরি করেছ কেন?"

"বুঝতে পারি নাই। ভেবেছিলাম, মোটাসোটা হবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে। বড় হবে বুঝতে পারি নাই।"

"এখন?"

অনিক মাথা চুলকিয়ে বলল, "আগে দেখতে হবে নিজের চোখে।"

"কীভাবে দেখবে? অন্ধকার না হলে বের হবে না।"

"অন্ধকারে দেখার স্পেশাল চশমা আছে, নাইট ভিশন গগলস। সেগুলো চোখে দিয়ে দেখা যেতে পারে।"

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তানের ঘরে কিছু এসে হাজির হলে আমরা সেটা দেখতে পাই।"

"হ্যাঁ।"

"ওদের ঘরের সেই যন্ত্রটায় ইঁদুর দূর করার শব্দটা বন্ধ করে দাও। তাহলে হয়তো এক দুইটা ভিতরে ঢুকবে, আমরা তখন দেখতে পাব।"

অনিক হাতে কিল দিয়ে বলল, "গ্রেট আইডিয়া। সত্যি কথা বলতে কী আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি।"

"কী কাজ?"

"ইঁদুরকে ঘরে ঢোকার জন্য স্পেশাল সাউন্ড দিতে পারি।"

"আছে সে রকম শব্দ?"

"হ্যাঁ, আছে। ইঁদুরের সঙ্গীত বলতে পার।"

"সঙ্গীত? ব্যান্ড সঙ্গীত?"

"ব্যান্ড সঙ্গীত না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সেটা জানি না, কিন্তু ইঁদুরেরা এই শব্দ শুনতে পছন্দ করে। শব্দ শুনলে কাছে এগিয়ে যায়।"

আমি বললাম, "লাগাও দেখি।"

অনিক তার যন্ত্রপাতির প্যানেলে চোখ বুলিয়ে কয়েকটা সুইচ অন করে, কয়েকটা অফ করে। বড় বড় কয়েকটা নব ঘুরিয়ে কিছু একটা দেখে বলল, "এখন ইঁদুরদের ঘরের ভেতরে আসার কথা!"

"ইঁদুরের সঙ্গীত লাগিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, দিয়েছি। তবে ইঁদুর আসবে কিনা জানি না। হাজার হলেও দিনের বেলা, দিনের বেলা ইঁদুর গর্ত থেকে বের হতে চায় না।"

আমরা বেশ কিছুক্ষণ বসে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম মোটাসোটা একটা ইঁদুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আসছে। টেলিভিশনের স্ক্রিনে ঠিক কত বড় বোঝা যায় না, কিন্তু তারপরেও আমরা অনুমান করে হতবাক হয়ে গেলাম। সেগুলো কমপক্ষে এক হাত লম্বা—লেজ নিয়ে প্রায় দুই হাত। ওজন পাঁচ কেজির কম না। এই বিশাল ইঁদুর ঘরের ভিতরে হাঁটতে লাগল। ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র শুঁকতে লাগল।

আমি কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে থেকে বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস বের করে বললাম, "সর্বনাশ! এ যে রাক্ষুসে ইঁদুর!"

"হ্যাঁ।" অনিক মাথা নাড়াল।

"ইঁদুর বলে ইঁদুর— একেবারে মেগা ইঁদুর।"

"ঠিকই বলেছ।" অনিক মাথা নাড়ল, "একেবারে মেগা ইঁদুর।"

কিছুক্ষণের মাঝেই আরও কয়েকটা মেগা ইঁদুর ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো।

বিল্লাল আর কাদির এমনিতেই খবিস ধরনের মানুষ। ঘরের ভেতর উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে শুরু করে নানা কিছু ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। বিশাল বিশাল ইঁদুরগুলো সেগুলো খেতে লাগল, দাঁত দিয়ে কাটাকাটি করতে লাগলো। ঘরের ভেতর এই বিশাল ইঁদুরগুলো কিলবিল কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র দাঁত দিয়ে কেটে কিছুক্ষণের মাঝে সব কিছু তছনছ করে দিল।

বিল্লাল মাস্তান আর কাদির মাস্তান যখন তাদের বাসায় ফিরে এসেছে তখন রাত প্রায় দশটা। তালা খুলে ভিতরে ঢোকার শব্দ পেয়েই ইঁদুরগুলি সোফার নিচে, খাটের তলায় দরজার কোণায় লুকিয়ে গেল। বিল্লাল আর কাদির ভিতরে ঢুকে ইতস্তত তাকায়, তাদের চোখে প্রথমে বিস্ময় তারপর ক্রোধের ছায়া পড়ল। বিশাল মেগা ইঁদুরগুলো ঘরটা তছনছ করে রেখেছে।

বিল্লাল বলল, "কে ঢুকেছে ঘরে?"

কাদির বলল, "আমি জানি না।"

"ঘরটার বারটা বাজিয়ে দিয়েছে—"

কাদির মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আর কী রকম একটা আঁশটে গন্ধ দেখেছ?"

বিল্লাল ইঁদুরে কেটে কুটি কুটি করে রাখা তার একটা শার্ট তুলে হুংকার দিয়ে বলল, "আমার শার্টটা কে কেটেছে?"

কাদির তার প্যান্টটা হাত নিয়ে বলল, "আমার প্যান্ট।"

বিল্লাল বলল, "আমার বালিশ।"

কাদির বলল, "আমার সোফা।"

বিল্লাল হঠাৎ শার্টের নিচে হাত দিয়ে একটা রিভলবার বের করল। সেটা হাতে নিয়ে বলল, "যেই ঢুকে থাকুক, সে এই ঘরে আছে।"

কাদিরও একটা কিরিচ হাতে নেয়। বলে, "ঠিকই বলেছেন বিল্লাল ভাই, দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরেই আছে।"

দুইজন তখন ঘরের ভিতর খুঁজতে থাকে। খুব বেশি সময় খুঁজতে হলো না। বিছানার নিচে উঁকি দিয়েই বিল্লাল একটা গগনবিদারি চিৎকার দেয়। তারপর যা একটা ব্যাপার শুরু হলো সেটা বলার মতো নয়। ইঁদুরগুলি এক সাথে বিল্লাল আর কাদিরে ওপর লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে আতঙ্কে বিল্লাল দুই একটা গুলি করে কিন্তু তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। ভিতরে ইঁদুরের সাথে মাস্তানদের একটা ভয়ঙ্কর খণ্ডযুদ্ধ শুরু হতে থাকে! দুইজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খায় আর বিশাল বিশাল লোমশ ইঁদুর তাদেরকে কামড়াতে থাকে। দেখে মনে হয় কিছুক্ষণের মাঝে দুজনকেই খেয়ে ফেলবে।

অনিক বলল, "সর্বনাশ!"

আমি বললাম, "তাড়াতাড়ি তোমার সুইচ অন করে ইঁদুর তাড়িয়ে দাও!"

অনিক দৌড়াদৌড়ি করে সুইচ অন করার চেষ্টা করে। সুইচ খুঁজে বের করে সেগুলো অন অফ করে নব ঘুরিয়ে যখন ইঁদুরগুলোকে দূর করল ততক্ষণে দুইজনের অবস্থা শোচনীয়। তাদের হৈচৈ চিৎকার শুনে বাইরে মানুষজন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। তার ভিতরে কয়েকজন পুলিশকেও দেখতে পেলাম।

অনিক বলল, "চলো। সরজমিনে দেখে আসি।"

আমি বললাম, "চলো।"

আমরা যখন গিয়েছি তখন পুলিশ দুইজনকে হ্যান্ডকাফ লাগাচ্ছে। ঘরের ভেতরে কয়েকশ' ফেন্সিডিলের বোতল, মদ গাঁজা হেরোইনের সাপ্লাই। নানারকম অস্ত্র গোলাগুলি— হাতেনাতে এরকম মাস্তানদের ধরা সোজা কথা নয়। বিল্লাল আর কাদিরকে চেনা যায় না— সারা শরীর কেটে কুটে রক্তাক্ত অবস্থা।

পুলিশের একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? তোমাদের এই অবস্থা কেন?"

বিল্লাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "এই এত বড় বড়—"

"এত বড় বড় কী?"

"ইঁদুরের মতো—"

পুলিশ অফিসার হা হা করে হাসলেন। বললেন, "এত বড় কখনো ইঁদুর হয় নাকি ?"

উপস্থিত মানুষদের একজন বলল, "মদ গাঁজা খেয়ে কী দেখতে কী দেখেছে!"

"নিজেরাই নিজের সাথে মারামারি করেছে।"

কাদির মাথা নেড়ে বলল, "জি না! আমরা মারামারি করি নাই।"

পুলিশ অফিসার দুইজনকে গাড়িতে তুলতে তুলতে বলল, "রিমান্ডে নিয়ে একটা দিলেই সব খবর বের হবে।"

সব লোকজন চলে যাবার পর শিউলি আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। দাঁত বের করে হেসে বলল, "এক নম্বুরি কাজ!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী কাজ এক নম্বুরি ?"

"এই যে মাস্তানদের দূর করলেন ?"

"কে দূর করেছে ?"

"আপনারা দুইজন।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জানো ?"

শিউলি খুক খুক করে হাসতে হাসতে বলল, "আমি সব জানি। খালি একটা কথা—"

"কী কথা ?"

"বিলাইয়ের সাইজের ইন্দুরগুলো কিন্তু দূর করতে হবে।"

অনিক হাসল। বলল, "মাস্তান দূর করে দিতে যখন পেরেছি— তখন তোমার এই ইঁদুরও দূর করে দেব।"

শিউলি তার সব কয়টি দাঁত বের করে বলল, "এই জন্যেই তো আপনাদের ইন্দুরওয়ালা ডাকি!"



কবি কিংকর চৌধুরী

টেলিফোনের শব্দে সকালবেলা ঘুম ভাঙল। বাংলাদেশে ঘুমের ব্যাপারে আমার চাইতে বড় এক্সপার্ট কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না, যদি ঘুমের ওপর কোন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থাকত সোনা না হলেও নির্ঘাত একটা রুপা কিংবা ব্রোঞ্জ পদক আনতে পারতাম। এরকম একটা এক্সপার্ট হিসেবে আমি জানি সকালের ঘুমটা হচ্ছে ঘুমের রাজা— এই সময় কেউ যদি ঘুমের ডিস্টার্ব করে তার দশ বছরের জেল হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু দেশে এখনো সেই আইন হয়নি। কাজেই আমাকে বিছানা থেকে উঠতে হলো। উঠতে গিয়ে আমি "আউক" বলে নিজের অজান্তেই একটা শব্দ করে ফেললাম, বেকায়দায় ঘুমাতে গিয়ে ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা।

কোনমতে ব্যথা সহ্য করে গিয়ে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।"

"ভাইয়া! এতক্ষণ থেকে ফোন বাজছে, ধরছ না, ব্যাপারটা কী ?"

গলা শুনে বুঝতে পারলাম ছোট বোন শিউলি, আমাদের পরিবারের সবচেয়ে বিপজ্জনক সদস্য। সব কিছু নিয়ে তার কৌতূহল এবং সব কিছু নিয়ে তার এক্সপেরিমেন্ট করার একটা বাতিক আছে। বিশেষ করে নতুন নতুন যে রান্নাগুলি সে আবিষ্কার করে, সেগুলিকে আমি সবচেয়ে ভয় পাই। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী হয়েছে ? এত সকালে ফোন করছিস ?"

"সকাল ? কয়টা বাজে তুমি জানো ?"

"কয়টা ?"

"সাড়ে দশটা।"

"সাড়ে দশটা অবশ্যই সকাল।" আমি হাই তুলে বললাম, "কী হয়েছে তাড়াতাড়ি বল। বাকি ঘুমটা শেষ করতে হবে।"

"তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি— সব সময় তোমার শুধু তাড়াতাড়ি।" ছোট বোন শিউলি বলল, "কোন কিছু যে ধীরে ধীরে সুন্দর করে করার একটা ব্যাপার আছে সেটা তুমি জানো ?"



আমার ঘুম চটকে গেল, সে যে কথাগুলি বলেছে সেগুলি মোটেও তার কথা না। শিউলি সব সময়েই ছটফট করে, হৈচৈ করে চিৎকার করে ছোটাছুটি করে! আমাকে উপদেশ দিচ্ছে ধীরে-সুস্থে কাজ করতে, সুন্দর করে কাজ করতে— ব্যাপারটা কী ? আমি বললাম, "তোর হয়েছে কী ? এভাবে কথা বলছিস কেন ?"

"কীভাবে কথা বলছি ?"

"বুড়ো মানুষের মতো। ধীরে ধীরে কাজ করা সুন্দর করে কাজ করা, এগুলো আবার কী রকম কথা ?"

শিউলি বলল, "মানুষের জীবন ক্ষণিকের হতে পারে কিন্তু সেটা খুব মূল্যবান। সেটা তাড়াহুড়ো করে অপচয় করা ঠিক না। সেটা সুন্দর হতে হবে, পবিত্র হতে হবে, কোমল পেলব হতে হবে—"

আমার ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেল, উত্তেজনায় ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে আবার প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে উঠে বললাম, "আউক!"

"আউক ?" শিউলি প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "ভাইয়া, তুমি এসব কী অশালীন অসুন্দর কথা বলছ ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—"

আমি এবারে পুরোপুরি রেগে আগুন হয়ে উঠে বললাম, "আমার ইচ্ছে হলে আউক বলব, ইচ্ছে হলে ঘাউক বলব, তোর তাতে এত মাথাব্যথা কিসের ?"

অন্যপাশে শিউলি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে তুমি রাগাতে পারবে না ভাইয়া। আমি ঠিক করেছি জীবনের যত অসুন্দর জিনিস তার থেকে দূরে থাকব। তোমাকে যে জন্যে ফোন করেছিলাম—"

"কী জন্যে এই সকালে ঘুম ভাঙিয়েছিস ?"

"আজ সন্ধেবেলা আমার বাসায় আস।"

"কী ব্যাপার ? খাওয়া-দাওয়া—"

"ইস ভাইয়া!" শিউলি কেমন যেন নেকু নেকু গলায় বলল, "তুমি খাওয়া ছাড়া আর কিছু বোঝ না। খাওয়াটা হচ্ছে একটা স্থূল ব্যাপার। পৃথিবীতে খাওয়া ছাড়া আরও সুন্দর বিষয় থাকতে পারে।"

"সেটা কী ?"

"আজকে বাসায় কবি কিংকর চৌধুরী আসবেন—"

"কী চৌধুরী ?"

শিউলি স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করল, "কিংকর চৌধুরী।"

"কিংকং চৌধুরী ? কিংকং গরিলার নাম, মানুষকে কিংকং ডাকছিস কেন ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "বেশি মোটা আর কালো নাকি ?"

"কিংকং না", শিউলি শীতল গলায় বলল, "কিংকর। কিংকর চৌধুরী।"

"কিংকর? কী অদ্ভুত নাম!"

"মোটেও অদ্ভুত না। কিংকর খুব সুন্দর নাম। তুমি বইপত্র পড়ো না বলে জানো না। কিংকর চৌধুরী বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। তার একটা করে কবিতার বই বের হয় সেগুলো হটকেকের মতো বিক্রি হয়। দেশের তরুণ-তরুণীরা তার জন্যেপাগল—"

"চেহারা কেমন?"

শিউলি থতমত খেয়ে বলল, "চেহারা?"

"হ্যাঁ। কালো আর মোটা নাকি?"

"মানুষের চেহারার সাথে তার সৃজনশীলতার কোন সম্পর্ক নাই।"

"তার মানে কালো আর মোটা।" আমি সবকিছু বুঝে ফেলেছি এরকম গলায় বললাম, "মাথায় টাক?"

"মোটেও টাক নাই। শিউলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "কপালের ওপর থেকে হুবহু রবীন্দ্রনাথ। চোখ দুটো একেবারে জীবনানন্দ দাশের। নাকের নিচের অংশ কাজী নজরুল ইসলাম। আর তোমার হিংসুটে মনকে শান্ত করার জন্যে বলছি, কবি কিংকর চৌধুরী মোটেও কালো আর মোটা নন। ফর্সা এবং ছিপছিপে। দেবদূতের মতো—"

"বুঝেছি।" আমি চিন্তিত গলায় বললাম, "এই কবিই তোর মাথা খেয়েছে। শরীফ কী বলে?"

শরীফ হচ্ছে শিউলির স্বামী, সেও শিউলির মতো আধপাগল। কোন কোন দিক দিয়ে মনে হয় পুরো পাগল। শিউলি বলল, "শরীফ তোমার মতো কাঠখোট্টা না, তোমার মতো হিংসুটেও না। শরীফই কবি কিংকর চৌধুরীকে বাসায় এনেছে—"

"বাসায় এনেছে মানে?" আমি আঁতকে উঠে বললাম, "এখন তোদের বাসায় পাকাপাকি উঠে এসেছে নাকি?"

"না ভাইয়া।" শিউলি শান্ত গলায় বলল, "তার নিজের বাসা আছে, ফ্যামিলি আছে, সেখানে থাকেন। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন।"

"হ্যাঁ, খুব সাবধান।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "কবি-সাহিত্যিকরা ছ্যাবলা টাইপের হয়। একটু লাই দিলেই কিন্তু মাথায় চড়ে বসবে— তোর বাসায় পাকাপাকিভাবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।"

"উহ! ভাইয়া—" শিউলি কান্না কান্না গলায় বলল, "তুমি একজন সম্মানী মানুষ নিয়ে এত বাজে কথা বলতে পারো, ছিঃ!"

"মোটেও বাজে কথা বলছি না। তুই কী জানিস?"

"অন্তত এইটুকু জানি কবি কিংকর চৌধুরী বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। বিখ্যাত মানুষ। সম্মানী মানুষ। তার সাথে কথা বলে আমরাও চেষ্টা করছি তার মতো হতে—"

"সর্বনাশ!" আচমকা ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে আবার রগে টান পড়ল, আমি আবার বললাম, "আউক!"

শিউলি না শোনার ভান করে বলল, "যদি একজন সত্যিকারের মানুষের সাথে দেখা করতে চাও, কথা বলতে চাও তাহলে সন্ধেবেলা এসো। কবি কিংকর চৌধুরী থাকবেন।"

খাবারের মেনুটা কী জিজ্ঞেস করার আগেই শিউলি টেলিফোন রেখে দিল। মনে হয় আমার ওপর রাগ করেছে। টেলিফোন রেখে দেবার পর আমার মনে হলো, কবি কিংকর চৌধুরীকে দেখে বিলু আর মিলি কী বলছে সেটা জিজ্ঞেস করা হলো না। বিলু আর মিলি হচ্ছে আমার ভাগ্নে-ভাগ্নি, একজনের বয়স আট অন্যজনের দশ, ঐ বাসায় এই দুইজন এখনো স্বাভাবিক মানুষ— বড় হলে কী হবে কে জানে! শিউলি-শরীফের পাল্লায় পড়ে কবি-সাহিত্যিকের পেছনে যে ঘোরাঘুরি শুরু করবে না কেউ তার গ্যারান্টি দিতে পারবে না। পাগলা-আধপাগল মানুষ নিয়ে যে কী মুশকিল!

শিউলি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, তাই আর বিছানায় ফেরত গিয়ে লাভ নেই। ঘাড়ের ব্যথাটাও মনে হয় ভালভাবেই ধরেছে! দাঁত ব্রাশ করা, শেভ করা, এই কাজগুলো করতে গিয়েও মাঝে মাঝে "আউক" শব্দ করতে হলো। বেলা বারোটার দিকে ঘর থেকে বের হয়েছি। বাসার বাইরে একজন দারোয়ান থাকে, আমাকে দেখেই দাঁত বের করে হি হি করে হেসে বলল, "স্যার, ঘাড়ে ব্যথা?"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতে গিয়ে "আউক" করে শব্দ করলাম। পুরো শরীর ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতে হলো, তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে আমার ঘাড়ে ব্যথা?"

"দশ মাইল দূর থেকে আপনাকে দেখলে বোঝা যায় স্যার। দুইটা জিনিস মানুষের কাছে লুকানো যায় না। একটা হচ্ছে ঘাড়ে ব্যথা আরেকটা—"

"আরেকটা কী?"

"সেটা শরমের ব্যাপার, আপনাকে বলা যাবে না।"

"ও।" শরমের ব্যাপারটা আমি আর জানার চেষ্টা করলাম না। আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, দারোয়ান আমাকে থামাল, বলল, "স্যার। ঘাড়ের ব্যথার জন্যে কী ওষুধ খাচ্ছেন?"

"এখানো কোন ওষুধ খাচ্ছি না।"

"ওষুধে কোন কাজ হয় না স্যার, যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মালিশ।"

"মালিশ ?"

"জে স্যার। সরিষার তেল গরম করে দুই কোয়া রসুন ছেড়ে দিবেন স্যার। সকালে এক মালিশ বিকালে আরেক মালিশ। দেখবেন ঘাড়ের ব্যথা কই যায়!"

"ঠিক আছে।" আমি ঘাড়ের ব্যথার ওষুধ জেনে বের হলাম। মোড়ের রাস্তায় যাবার সময় শুনলাম পানের দোকান থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "ঘাড়ে ব্যথা ?"

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে গিয়ে যন্ত্রণায় "আউক" করে শব্দ করলাম। পুরো শরীর ঘুরিয়ে তাকাতে হলো, পানের দোকানের ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একজনের ঘাড়ে ব্যথা হলে অন্যকে কেন হাসতে হবে ? আমি বললাম, "হ্যাঁ। ঘাড়ে ব্যথা।"

"কমলার রস খাবেন। দিনে তিনবার। দেখবেন ব্যথা বাপ বাপ করে পালাবে।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে।"

আমি দশ পাও সামনে যাইনি, একজন আমাকে থামাল, "জাফর ইকবাল সাহেব না ?"

"জি।"

"ঘাড়ে ব্যথা ?"

মানুষটা কে চেনার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "জি। সকাল থেকে উঠেই ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড়ে ব্যথায় একটাই চিকিৎসা, ঠাণ্ডা-গরম চিকিৎসা।"

"ঠাণ্ডা-গরম ?"

"জি। আইসব্যাগ আর হট ওয়াটার ব্যাগ নিবেন। দুই মিনিট আইসব্যাগ দুই মিনিট হট ওয়াটার ব্যাগ। ব্লাড সারকুলেশান বাড়বে আর ব্লাড সারকুলেশন হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান। দুই দিনে সেরে যাবে।"

"ও আচ্ছা।" আমি মানুষটার দিকে তাকিয়ে তার পরিচয় জানতে চাচ্ছিলাম, তার আগেই সে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল। আমাদের দেশের মানুষের মনে হয় রোগের চিকিৎসা নিয়ে উপদেশ দেয়া ছাড়া আর কোন কিছুর জন্যে সময় নেই।

সারাদিনে অন্তত শ' খানেক পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষ আমার ঘাড়ে ব্যথা কেমনভাবে সারানো যায় সেটা নিয়ে উপদেশ দিল। সবচেয়ে সহজটি ছিল তিনবার কুলহু আল্লাহ পড়ে ফুঁ দেয়া। সবচেয়ে কঠিনটি হচ্ছে জ্যান্ত দাড়াস সাপ ধরে এনে শক্ত করে তার লেজ এবং মাথা টিপে ধরে শরীরটা ঘাড়ে ডাল মরে

ডলে নেয়া। আশ্চর্যের ব্যাপার এই শ'খানেক মানুষের মাঝে একজনও আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলল না। বিকালবেলা আমি তাই ঠিক করলাম ডাক্তারের কাছেই যাব।

কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে একটু সমস্যার মাঝে ছিলাম, তখন সুব্রতের কথা মনে পড়ল। আমি কাছাকাছি একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে সুব্রতকে ফোন করতেই সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "কে, জাফর ইকবাল ?"

"হ্যাঁ।"

"কী হয়েছে তোর ? এইরকম সময়ে ফোন করছিস ? কোন সমস্যা ?"

"না-না, কোন সমস্যা না।" আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বললাম, "একটা ডাক্তারের খোঁজ করছিলাম।"

"ডাক্তার ?" সুব্রত প্রায় চিৎকার করে বলল, "কেন ? কার জন্যে ডাক্তার ? কী হয়েছে ? সর্বনাশ!"

"সেরকম কিছু হয় নাই। আমার নিজের জন্যে।"

"তোর নিজের জন্যে ? কেন ? কী হয়েছে তোর ?"

"ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড়ে ব্যথা ?" সুব্রত হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল, আমার মনে হলো আমি যেন ঘাড়ে ব্যথা না বলে ভুল করে লিভার ক্যান্সার বলে ফেলেছি। সুব্রত থমথমে গলায় বলল, "কোন ঘাড়ে ?"

"দুই ঘাড়েই। বামদিকে একটু বেশি।"

সুব্রত আর্তনাদ করে বলল, "বামদিকে একটু বেশি ? সর্বনাশ!"

"এর মাঝে সর্বনাশের কী আছে ?"

"হার্ট এ্যাটাকের আগে এভাবে ব্যথা হয়। ঘাড়ে-হাতে ছড়িয়ে পড়ে। আমার আপন ভায়রার ছোট শালার এরকম হয়েছিল। হাসপাতালে নেবার আগে শেষ।"

এবারে আমি বললাম, "সর্বনাশ!"

"তুই কোন চিন্তা করিস না। আমি আসছি।"

"আয় তাহলে।"

"কোথায় আছিস তুই ?"

আমি রাস্তার ঠিকানাটা দিলাম, সুব্রত টেলিফোন রাখার আগে জিজ্ঞেস করল, "তোর কি শরীর ঘামছে ?"

"না।"

"বুকের মাঝে কি চিনচিনে ব্যথা আছে ? মনে হয় কিছু একটা চেপে বসে আছে ?"

আমি দুর্বল গলায় বললাম, "না সেরকম কিছু নেই।"

"ঠিক আছে। তুই বস, আমি আসছি। কোন চিন্তা করবি না।"

আমি ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে বসে রইলাম। দোকানের মালিক খুব বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল, আমি বেশি গা করলাম না। সত্যি যদি হার্ট অ্যাটাক হতেই হয় এখানে হোক, সুব্রত তাহলে খুঁজে পাবে। রাস্তাঘাটে হার্ট-অ্যাটাক হলে উপায় আছে!

বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগল, ঘাড়ের ব্যথাটা আস্তে আস্তে ঘাড় থেকে হাতে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু পরে মনে হলো, বুকে ব্যথা করতে শুরু করেছে। মনে হতে লাগল হাত ঘামতে শুরু করেছে, খানিকক্ষণ পর মনে হলো শুধু হাত না শরীরও ঘামছে। আমার শরীর দুর্বল লাগতে থাকে, মাথা ঘুরতে থাকে এবং হাত-পা কেমন জানি অবশ হয়ে আসতে থাকে। জীবনের আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি তখন সুব্রত এসে হাজির। আমাকে দেখে উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী অবস্থা?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "বেশি ভাল না।"

"তুই কোন চিন্তা করিস না। ডাক্তারকে ফোন করে দিয়েছি। আয়।"

"ডাক্তারের নাম কী?"

সুব্রত আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুই ডাক্তারের নাম দিয়ে কী করবি?"

"কোথায় বসে?"

"সেটা জেনে তোর কী লাভ? আয় আমার সাথে।"

আমাকে একটা সিএনজিতে তুলে সুব্রত ধানমণ্ডিতে এক জায়গায় নিয়ে এলো। ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে অনেক মানুষজন কিন্তু সুব্রত কীভাবে কীভাবে জানি সব মানুষকে পাশ কাটিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাক্তারের বয়স হয়েছে, চুল পাকা। চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সমস্যা?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড় থাকলেই ঘাড় ব্যথা হবে। যাদের ঘাড় নেই, তাদের ঘাড়ের ব্যথাও নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাদের ঘাড় নেই?"

"ব্যাঙদের। তাদের গলা-ঘাড় কিছু নেই। মাথার পরেই ধড়।"

সুব্রত আমার পাশে বসে ছিল, আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তোর ব্যাঙ হয়েই জন্ম নেয়া উচিত ছিল।"

ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

সুব্রত বলল, "দেখছেন না ব্যাঙের মতন মোটা হয়েছে। এ শুধু খায় আর ঘুমায়।"

ডাক্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি নাকি?"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিতে গিয়ে যন্ত্রণার কারণে বললাম, "আউক।"

সুব্রত বলল, "আউক মানে হচ্ছে ইয়েস।"

ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আসেন, কাছে আসেন।"

আমি ভয়ে ভয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার আমার ঘাড় ধরে খানিকক্ষণ টেপাটেপি করলেন, ব্লাড প্রেসার মাপলেন, স্টেথিস্কোপ কানে লাগিয়ে কিছুক্ষণ বুকের ভেতরে কিছু একটা শুনলেন তারপর মুখ সুচালো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"কী হয় নাই?"

"মা-মানে?"

ডাক্তার সাহেব রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনার আমার কাছে না এসে যাওয়া উচিত ছিল দশতলা একটা বিল্ডিংয়ের ছাদে।"

"কেন?"

"নিচে লাফিয়ে পড়ার জন্যে।"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "নিচে লাফিয়ে পড়ার জন্যে? নিচে লাফিয়ে পড়ব কেন?"

"সুইসাইড করার জন্যে।" ডাক্তার সাহেব আমার দিকে রাগ রাগ চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তাই তো করছেন। শুধু খান আর ঘুমান। কোনরকম এক্সারসাইজ নাই, শারীরিক পরিশ্রম নেই। আস্তে আস্তে ব্লাড প্রেসার হবে, ডায়াবেটিস হবে। কোলেস্টেরল হবে। আর্টারি ব্লক হবে। হার্ট অ্যাটাক হবে। গ্লুকোমা হবে। কিডনি ফেল করবে। স্ট্রোক হয়ে শরীর প্যারালাইজড হয়ে যাবে। বিছানায় পড়ে থাকবেন। বিছানায় খাওয়া, বিছানায় পাইখানা-পিসাব।"

শেষ কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম, বলে কী ডাক্তার সাহেব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বি-বিছানায় খাওয়া। বিছানায় পা পা—"

কথা শেষ করার আগে ডাক্তার সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর টেবিলে কিল মেরে বললেন, "বিয়ে করেছেন?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "এখনো করি নাই।"

"তাড়াতাড়ি করে ফেলেন। বোকাসোকা টাইপের একটা মেয়েকে বিয়ে করবেন।"

সুব্রত বলল, "সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ডাক্তার সাহেব। যার মাথায় ছিটেফোঁটা বুদ্ধি আছে, সে একে বিয়ে করবে ভেবেছেন?"

সুব্রত কথাটা মিথ্যে বলেনি কিন্তু সত্যি কথা কি সবসময় শুনতে ভাল লাগে? আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "বোকাসোকা মেয়েকে কেন বিয়ে করতে হবে?"

"যখন স্ট্রোক হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবেন তখন নাকের ভেতর নল দিয়ে খাওয়াতে হবে না? পাইখানা-পিসাব পরিষ্কার করতে হবে না? চালাক-চতুর একটা মেয়ে হলে সেটা করবে ভেবেছেন? করবে না। সেইজন্যে খুঁজে খুঁজে বোকাসোকা মেয়ে বের করবেন। বুঝেছেন?"

আমি পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, "তাহলে কী হবে আমার ডাক্তার সাহেব?"

"কী আর হবে? মরে যাবেন।"

"মরে যাব?"

"হ্যাঁ। আস্তে আস্তে সুইসাইড করে কী হবে? দশতলা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে একটা লাফ দেন। একবারে কাজ কমপ্লিট।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "কিন্তু কিন্তু—"

"আর যদি সুইসাইড না করতে চান, যদি বেঁচে থাকতে চান তাহলে আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা এক্সারসাইজ করবেন।"

"এ-এক ঘণ্টা?"

"হ্যাঁ। এক ঘণ্টা। হাঁটবেন। হাঁটা হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ব্যায়াম। আর যদি না হাঁটেন, যদি না ব্যায়াম করেন তাহলে আজকে ঘাড় ব্যথা, কালকে কোমর ব্যথা, পরশু বুকে ব্যথা তারপরের দিন—" ডাক্তার সাহেব মুখে কথা না বলে হাত দিয়ে গলায় পোচ দেবার ভঙ্গি করে আমার কী হবে বুঝিয়ে দিলেন।

আমি ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। ডাক্তার সাহেব তার প্যাডটা টেনে নিয়ে সেখানে খসখস করে কী একটা লিখে দিয়ে বললেন, "ঘাড়ে ব্যথার জন্যে একটু ওষুধ লিখে দিলাম, ব্যথা অসহ্য মনে হলে খাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ঘাড় ব্যথাটা কিন্তু কিছু না! নিয়মিত ব্যায়াম না করে শরীরকে যদি ফিট না করেন, তাহলে আপনি শেষ। আপনার পেছনে পেছনে কিন্তু গুপ্তঘাতক ঘুরছে, আপনি টের পাচ্ছেন না, কিছু বোঝার আগেই আপনার জীবন শেষ করে দেবে।" খুব মজার একটা কথা বলেছেন এরকম ভান করে ডাক্তার সাহেব আনন্দে হা হা করে হেসে উঠলেন।

সুব্রত বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না ডাক্তার সাহেব, জাফর ইকবাল যেন প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে হাঁটে আমি নিজে সেই দায়িত্ব নিচ্ছি।"

"ভেরি গুড।" ডাক্তার সাহেব তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর একটা হাসি দিয়ে বললেন, "গুড লাক!"

ডাক্তার সাহেবের চেম্বার থেকে বের হবার পর সুব্রত বেশ কিছুক্ষণ আমাকে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল করল, আমি মুখ বুজে সেগুলি সহ্য করে নিলাম। আমি যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা না হাঁটি তাহলে সে আমাকে কীভাবে শাস্তি দেবে সেরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা বলতে লাগল। আমি তাকে কথা দিলাম যে, এখন থেকে আমি নিয়মিতভাবে দিনে এক ঘণ্টা করে হাঁটব।

অনেক কষ্ট করে সুব্রতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমেই একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একটা ডাবল হ্যামবার্গার খেয়ে নিলাম। মন খারাপ হলেই আমার কেন জানি খিদে পায়। প্যারালাইসিস হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি এবং আমার বোকাসোকা একটি বউ নাকের ভেতরে নল ঢুকিয়ে সেদিক দিয়ে খাওয়াচ্ছে, সেটা চিন্তা করেই আমার ডুকরে কেঁদে ওঠার ইচ্ছে করছে। আরও একটা হ্যামবার্গার অর্ডার দেবার কথা ভাবছিলাম তখন আমার বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার কথা মনে পড়ল, তার সাথে বিষয়টা আলোচনা করে দেখলে হয়।

অনিক বাসাতেই ছিল, আমাকে দেখে খুশি হয়ে গেল, বলল, "আরে! জাফর ইকবাল, কী খবর তোমার?"

আমি উত্তর দিতে গিয়ে মাথা নাড়াতেই বেকায়দায় ঘাড়ে টান পড়ল, যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে বললাম, "আউক!"

অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "ঘাড়ে ব্যথা?"

আমি মাথা নাড়তে গিয়ে দ্বিতীয়বার বললাম, "আউক!"

অনিক বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

আমি বললাম, "কোন জিনিসটা ইন্টারেস্টিং?"

"এই যে তুমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ আউক শব্দ করে! কোনটা আস্তে কোনটা জোরে। একটাই শব্দ ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারণ করছ, উচ্চারণ করার ভঙ্গি দিয়ে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছ। আমার মনে হয় একটা ভাষা এভাবে গড়ে উঠতে পারে। শব্দ হবে মাত্র একটা কিন্তু সেই শব্দটা দিয়েই সবরকম কথাবার্তা চলতে থাকবে। কী মনে হয় তোমার?"

আমি চোখ কটমট করে অনিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি মারা যাচ্ছি ঘাড়ের যন্ত্রণায় আর তুমি আমার সাথে মশকরা করছ?"

অনিক বলল, "আমি আসলে মশকরা করছিলাম না, সিরিয়াসলি বলছিলাম। তা যাই হোক— ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলেছে ডাক্তার ?"

"ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে বেশি কিছু বলে নাই কিন্তু প্রতিদিন এক ঘন্টা ব্যায়াম করতে বলেছে। যদি না করি তাহলে নাকি মারা পড়ব। ব্লাড প্রেশার হবে, ডায়াবেটিস হবে, হার্ট অ্যাটাক হবে, কিডনি ফেল করবে, গ্লুকোমা হবে তারপর একসময় স্ট্রোক হয়ে বিছানায় পড়ে থাকব। নাকের ভেতর নল দিয়ে খাওয়াতে হবে।"

"কে খাওয়াবে ?"

"ডাক্তার সাহেব একটা বোকাসোকা টাইপের মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেন। সে খাওয়াবে।"

আমার কথা শুনে অনিক হা হা করে হাসতে লাগল। আমি বললাম, "তুমি হাসছ ? এটা হাসির ব্যাপার হলো ?"

অনিক বলল, "ডাক্তার সাহেব বুদ্ধিমান মানুষ। তোমাকে দেখেই বুঝেছেন। এমনি বললে কাজ হবে না, তাই তোমাকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু না—"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ। তোমার এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই।"

"ঠিক বলছ ?"

"হ্যাঁ। তবে ডাক্তার সাহেবের কথা তোমার শুনতে হবে। তুমি যেভাবে খাও আর ঘুমাও সেটা ঠিক না। তুমি একেবারেই ফিট না। কেমন যেন ঢিলেঢালা টাইপের মোটা। তোমার কোন এক ধরনের ব্যায়াম করা উচিত।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, শরীরে তেল মেখে একটা নেংটি পরে আমি হুম হাম করে বুকডন দিচ্ছি দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার কষ্ট হলো। অনিক মনে হয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারল, বলল, "হাঁটাহাঁটি দিয়ে শুরু করতে পারো। আগে যেসব জায়গায় রিকশা করে যেতে, সিএনজি করে যেতে, এখন সেসব জায়গায় হেঁটে যাবে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "আইডিয়াটা খারাপ না। আজ রাতে আমার বোনের বাসায় যাবার কথা। এখান থেকে হেঁটে চলে যাব, কী বলো ? আজ থেকেই শুরু করে দেয়া যাক।"

অনিক বলল, "হ্যাঁ। আজ থেকেই শুরু করো। দেখবে তোমার নিজেরই ভাল লাগবে।"

আমি আর অনিক ব্যায়াম নিয়ে, শরীর আর স্বাস্থ্য নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম, অনিক নতুন আবিষ্কার কী কী করেছে তার খোঁজখবর নিলাম তারপর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-গায়ক-সাংবাদিক-খেলোয়াড় সবাইকে নিয়ে খানিকক্ষণ হাসি-তামাশা করলাম। অনিক কয়েকটা চিপসের প্যাকেট খুলল। সেগুলো খেয়ে দুই গ্লাস পেপসি খেয়ে রাত আটটার দিকে আমি শিউলির বাসায় রওনা দিলাম। অন্যদিন হলে নির্ঘাত একটা রিকশায় চেপে বসতাম, আজ হেঁটে যাবার ইচ্ছা।

শুরুটা খুব খারাপ হলো না, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আমি দরদর করে ঘামতে শুরু করলাম। দশ মিনিট পর আমি রীতিমতো হাঁসফাঁস করতে থাকি, মনে হতে থাকে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আরও পাঁচ মিনিট পর আমার পা আর চলতে চায় না, পায়ের গোড়ালি থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত ব্যথায় টনটন করতে থাকে। এমনিতেই ঘাড়ে ব্যথা, সেই ব্যথাটা মনে হয় একশ' গুণ বেড়ে গিয়ে শরীরের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকবার পা ফেলতেই ব্যথাটা ঘাড় থেকে একসাথে ওপরে এবং নিচে নেমে আসে এবং আমি ককিয়ে উঠি, "আউক!"

শেষপর্যন্ত যখন শিউলির বাসায় পৌঁছালাম তখন মনে হলো বাসার দরজাতেই হার্টফেল করে মরে যাব। জোরে জোরে কয়েকবার বেল বাজালাম, দরজা খুলে দিল মিলি, আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সোফার মাঝে ধরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়ে পড়লাম। আমার মুখ দিয়ে বিকট এক ধরনের শব্দ বের হতে লাগল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম এবং দরদর করে ঘামতে লাগলাম। এইভাবে মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, বুকের হাঁসফাঁস ভাবটা একটু যখন কমেছে তখন আমি চোখ খুলে তাকালাম এবং আবিষ্কার করলাম পাঁচজোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মিলি এবং বিলুর দুই জোড়া চোখে বিস্ময় এবং মনে হলো একটু আনন্দ। শিউলির এক জোড়া চোখে দুঃখ এবং হতাশা। শরীফের চোখে অবিশ্বাস এবং কৌতুক। পঞ্চম চোখ জোড়া একজন অপরিচিত মানুষের, তার লম্বা চুল এবং ঢুলুঢুলু চোখ। সেই চোখে ভয়, আতঙ্ক এবং ঘৃণা। আমি একটু ধাতস্ত হয়ে সোজা হয়ে বসতে গেলাম, সাথে সাথে ঘাড়ে বেকায়দা টান পড়ল, আমি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে বললাম, "আউক।"

শিউলি আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, "ভাইয়া, তোমার এ কী অবস্থা ?"

আমি ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, "ঘাড়ে ব্যথা।"

"ঘাড়ে ব্যথা হলে বের হয়েছে কেন ?"

"তুই না আসতে বললি!"

"আমি তোমাকে এইভাবে আসতে বলেছি ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

আমি রেগে বললাম, "ছিঃ ছিঃ করছিস কেন ?"

এবারে মনে হলো শিউলিও রেগে উঠল, বলল, "আয়নায় নিজের চেহারাটা একটু দেখেছ ? এভাবে কেউ ঘামে ? এভাবে সোফায় বসে ? কেউ এরকম হাঁসফাঁস করে ? ভাইয়া, তোমার পুরো আচার-আচরণে এক ধরনের বর্বর ভাব আছে।"

"ঢং করিস না।" আমি শার্টের বোতাম খুলে তার তলা দিয়ে পেট এবং বগল মোছার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "এরকম ঢং করে কথা বলা কোন দিন থেকে শিখেছিস ? সোজা বাংলায় কথা বলবি আমার সাথে, তা না হলে কিন্তু তোকে কিলিয়ে ভর্তা করে দেব।"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভাইয়া! তুমি এরকম অসভ্যের মতন কথা বলছ কেন ? দেখছ না এখানে বাইরের মানুষ আছেন ? তিনি কী ভাবছেন বলো দেখি!"

লম্বা চুল এবং ঢুলুঢুলু চোখের মানুষটা নাকি গলায় বলল, "নাঁ নাঁ শিঁউলি তুঁমি আঁমার জঁন্যে এঁকটুও চিঁন্তা কঁরো নাঁ। আঁমি পুঁরো ব্যাঁপারটা উঁপভোগ কঁরছি।"

শিউলি বলল, "কোন জিনিসটা উপভোগ করছেন কিংকর ভাই ?"

এই তাহলে সেই কবি কিংকর চৌধুরী ? যার কপালের ওপরের অংশ রবীন্দ্রনাথের মতো, চোখ জীবনানন্দ দাশের মতো এবং থুতনির নিচে কাজী নজরুল ইসলামের মতো ? যে শিউলির এবং শরীফের মাথাটা খেয়ে বসে আছে! আমি ভাল করে মানুষটার দিকে তাকালাম, আমার মনে হলো মাথাটা শেয়ালের মতো, চোখগুলো পেঁচার মতো, নাকটা শকুনের মতো এবং মুখটা খাটাসের মতো। মানুষটা যত বড় কবিই হোক না কেন, আমি দেখামাত্র তাকে অপছন্দ করে ফেললাম। মানুষ যেভাবে মরা টিকটিকির দিকে তাকায় আমি সেভাবে তার দিকে তাকালাম।

কবি কিংকর চৌধুরী আমার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে চিকন ইঁদুরের মতো দাঁত বের করে একটু হেসে নাকিসুরে বলল, "আঁমি কোঁন জিঁনিসটা উঁপভোগ কঁরছি জাঁনতে চাঁও ?"

শিউলি বলল, "জানতে চাই কিংকর ভাই।"

কবি কিংকর চৌধুরী খুব একটা ভাব করে বলল, "আঁমি তো সুঁন্দরের পূঁজারী। সাঁরা জীবন সুঁন্দর জিঁনিস, শোঁভন জিঁনিস আঁর কোঁমল জিঁনিস দেঁখে এঁসেছি। তাঁই যঁখন কোঁন অঁসুন্দর জিঁনিস অশাঁলীন জিঁনিস দেঁখি ভাঁরি অঁবাক লাঁগে, চোঁখ ফেঁরাতে পাঁরি নাঁ—"

আমার ইচ্ছে হলো এই কবির টুঁটি চেপে ধরি। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করলাম। কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "সঁত্যি কঁথা বঁলতে কী, এঁই বিঁচিত্র মাঁনুষটাকে দেঁখে চঁমৎকার এঁকটা কঁবিতার লাঁইন মাঁথায় চঁলে এঁসেছে। লাঁইনটা হঁচ্ছে—" কবি মুখটা ছুচোর মতো সুচালো করে বলল, "আঁউক শঁব্দ কঁরে জেঁগে ওঁঠে পিঁচ্ছিল প্রাঁণী—"

আমি এবার লাফিয়ে উঠে মানুষটার গলা চেপে ধরেই ফেলছিলাম, শরীফ আমাকে থামাল, খপ করে হাত ধরে বলল, "ভাই, হেঁটে টায়ার্ড হয়ে এসেছেন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসেন।"

বিলু আর মিলি আমার দুই হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "চলো মামা চলো, ভেতরে চলো।"

আমি অনেক কষ্ট করে কয়েকবার আউক আউক করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কবির দিকে তাকিয়ে বললাম, "কবি সাহেব, আপনার কি সর্দি লেগেছি ?"

কবি কিংকর চৌধুরী চমকে উঠে বলল, "কেঁন সঁর্দি লাঁগবে কেঁন ?"

আমি বললাম, "ফ্যাঁত করে নাকটা ঝেড়ে সর্দি ক্লিয়ার করে ফেলুন, তাহলে আর নাঁকি সুঁরে কঁথা বঁলতে হঁবে নাঁ!"

আমার কথা শুনে কবি কিংকর চৌধুরী কেমন জানি শিউরে উঠল, মনে হলো ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে! কিন্তু তার আগেই মিলু আর বিলু হি হি করে হাসতে হাসতে প্রায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। শিউলি ধমক দিয়ে বলল, "ভেতরে যাও মিলু-বিলু। অভদ্রের মতো হাসছ কেন ?"

আমি দুজনকে দুই হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলাম। বিলু আর মিলুর সাথে আমিও তখন হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছি। হাসির মতো ছোঁয়াচে আর কিছু নেই।

মিলু-বিলুর ঘরে আমি ঘামে ভেজা শার্ট খুলে আরাম করে বসলাম। বিলু ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছে, মিলু তারপরেও একটা পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। আমি পেট চুলকাতে চুলকাতে বললাম, "তারপর বল তোদের কী খবর ?"

মিলু মুখ কালো করে বলল, "খবর ভাল না মামা।"

"কেন ? কী হয়েছে ?"

"দেখলে না নিজের চোখে ? কবি কাকু এসে আমাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে ?"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "কেন ? কী হয়েছে ?"

"আমরা জোরে কথা বলতে পারি না। হাসতে পারি না। টেলিভিশন দেখতে পারি না। আম্মু এই লম্বা লম্বা কবিতা মুখস্থ করতে দিয়েছে।"

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "এত বড় সাহস শিউলির ?"

বিলু বলল, "শুধু আম্মু না মামা— আব্বুও সাথে তাল দিচ্ছে।"

বিলু বলল, "তাল দিচ্ছে বলছিস কী ? আব্বুই তো প্রথমে কবি কাকুকে বাসায় আনল।"

আমি হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে গিয়ে যন্ত্রণায় "আউক" করে শব্দ করলাম। সাথে সাথে মিলু আর বিলু হি হি করে হাসতে শুরু করল। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "হাসছিস কেন গাধারা ?"

মিলু হাসতে হাসতে বলল, "তুমি যখন আউক শব্দ করো সেটা শুনলেই হাসিতে পেট ফেটে যায়।"

আমি বললাম, "আমি মরি যন্ত্রণায় আর তোরা সেটা নিয়ে হাসিস ? মায়া-দয়া বলে তোদের কিছু নেই ?"

সেটা শুনে দুজনে আরও জোরে হাসতে শুরু করে। কিন্তু একটু পরেই তাদের হাসি থেমে গেল। মিলু মুখ কাচুমাচু করে বলল, "এই কবি কাকু আসার পর থেকে বাসায় কোন আনন্দ নেই। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে।"

আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, "খাওয়া-দাওয়া নষ্ট হয়েছে মানে ?"

"কবি কাকু খালি শাক-শবজি খায় তো তাই বাসায় আজকাল মাছ-মাংস কিছু রান্না হয় না।"

আমি বললাম, "বলিস কী তোরা ?"

"সত্যি মামা। বিশ্বাস করো।"

"এই কবি মাছ-মাংস খায় না ?"

"উঁহু। শুধু শাক-সবজি। আর খাবার স্যালাইন।"

"খাবার স্যালাইন!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "খাবার স্যালাইন একটা খাবার জিনিস হলো নাকি ? আমি না শুনেছি মানুষের ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন খায়!"

বিলু মাথা নাড়ল, "উঁহুঁ মামা। কবি কাকু সবসময় চুকচুক করে খাবার স্যালাইন খেতে থাকে। আম্মু-আব্বুকে বুঝিয়েছেন এটা খাওয়া নাকি ভাল, এখন আব্বু-আম্মু সবসময় আমাদেরকে স্যালাইন খাওয়ানোর চেষ্টা করে।"

"এত বড় সাহস শিউলির আর শরীফের ?"

মিলু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আম্মু-আব্বুর দোষ নাই মামা। সব ঝামেলা হচ্ছে কবি কাকুর জন্যে—"

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "খুন করে ফেলব এই কবির বাচ্চা কবিকে—"

"করতে চাইল করো, কিন্তু দেরি করো না। দেরি হলে কিন্তু আমাদের জীবন শেষ।"

"আর না করতে চাইলে এখনি বলে দাও।" বিলু মুখ শুকনো করে বলল, "আমাদের মিছিমিছি আশা দিও না।"

আমি বিলু আর মিলুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "বিলু, মিলু তোরা চিন্তা করিস না। আমি কোন একটা হেস্তনেস্ত করে দেব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু খাওয়ার ওপরে হস্তক্ষেপ কোনভাবে সহ্য করব না।" উত্তেজনায় বেশি জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলেছিলাম বলে যন্ত্রণায় আবার শব্দ করতে হলো, "আউক।"

আর সেই শব্দ শুনে বিলু আর মিলু আবার হি হি করে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর শিউলি এসে বলল, "ভাইয়া খেতে আসো। আর তোমার দোহাই লাগে, খাবার টেবিলে বসে তুমি কোন উল্টাপাল্টা কথা বলবে না।"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "আমি কখনো উল্টাপাল্টা কথা বলি না। কিন্তু আমার সাথে কেউ উল্টাপাল্টা কথা বললে আমিও তাকে ছেড়ে দিই না।"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "প্লিজ, ভাইয়া, প্লিজ। কবি কিংকর চৌধুরী খুব বিখ্যাত মানুষ, খুব সম্মানী মানুষ। তাকে যা ইচ্ছে তা বলে ফেলো না।"

"সে যদি বলে আমি তাকে ছেড়ে দিব ভেবেছিস ? আর পেত্নীর মতো নাকি সুরে কথা বলে কেন ? শুনলেই মেজাজ খাট্টা হয়ে যায়।"

শিউলি বলল, "ওনার কথা বলার স্টাইলই ওরকম।"

"স্টাইলের খেতা পুড়ি। এরপর থেকে বলবি নাক ফেড়ে আসতে।"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "প্লিজ, ভাইয়া প্লিজ!"

খাবার টেবিলে গিয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। মিলু আর বিলু ঠিকই বলেছে, টেবিলে শাকভর্তা ডাল এরকম কিছু জিনিস। মাছ-মাংস ডিম জাতীয় কিছু নেই। কবি কিংকর চৌধুরী ঢুলুঢুলু চোখে বলল, "শিউলি তোঁমার হার্তের পঁটল ভঁর্তাটা যাঁ চমৎকার, এঁকেবারে বিষ্ণু দেঁর এঁকটা কঁবিতার মঁতো।"

শিউলি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কী রে শিউলি! শুধু দেখি ঘাস লতা পাতা রেঁধে রেখেছিস। আমাদেরকে কি ছাগল পেয়েছিস নাকি ?"

শিউলি বলল, "আজকে নিরামিষ মেনু।"

"মানুষকে দাওয়াত দিয়ে নিরামিষ খাওয়াচ্ছিস, ব্যাপারটা কী ?"

কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "মাঁছ মাঁংস খাঁওয়া বর্বরতা। ওঁসব খেঁলে পঁড রিপু জেঁগে ওঠে।"

"কে বলেছে ?" আমি টেবিলে কিল দিয়ে বললাম, "পৃথিবীর সব মানুষ মাছ-মাংস খাচ্ছে। তাদের কি পশু রিপু জেগেছে ? লেজ গজিয়েছে ?"

কবি কিংকর চৌধুরী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "পৃঁথিবীর সঁব মাঁনুষ মাঁছ-মাঁংস খাঁয় নাঁ। দঁক্ষিণ ভাঁরতের মাঁনুষেরা নিঁরামিশাষী। তাঁদের কাঁছ থেঁকে খাঁদ্যাভ্যাসটি আঁমাদের শেঁখার আঁছে।"

আমি বললাম, "আমাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস কি খারাপ নাকি যে অন্যদের থেকে শিখতে হবে ? আর অন্যদের থেকে যদি শিখতেই চান তাহলে কোরিয়ানরা দোষ করল কী ? তাদের মতো কুকুরের মাংস খাওয়া শুরু করেন না কেন ? খাবেন নাকি ?"

শিউলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভাইয়া—"

আমি না শোনার ভান করে বললাম, "কিংবা চায়নিজদের মতো ? তারা নাকি তেলাপোকা খায়। খাবেন আপনি তেলাপোকা ? ডুবো তেলে মুচমুচে করে আনব ভেজে কয়টা তেলাপোকা ? মুখে পুরে কচমচ করে খাবেন ?"

শিউলি প্রায় আর্তনাদ করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই মিলু আর বিলু হি হি করে হাসতে শুরু করল, হাসি আর থামতেই চায় না। শিউলি চোখ গরম করে বলল, "মিলু-বিলু অসভ্যের মতো হাসছিস কেন ? হাসি বন্ধ কর এই মুহূর্তে।"

দুজনে হাসি বন্ধ করলেও একটু পরে পরে হাসির দমকে তাদের শরীর কেঁপে উঠতে লাগল। কবি কিংকর চৌধুরীও একটা কথা না বলে বিষ্ণু দে'র কবিতার মতো পটল ভর্তা খেতে লাগল। আমিও জোর করে ঘাস-লতাপাতা খেয়ে কোনমতে পেট ভরালাম। খাবার টেবিলে আমাদের দেখলে যে কেউ বলবে নিশ্চয়ই খুব বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে— কারো মুখে একটা কথা নাই!

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করলাম, একটু পরে পরে মিলু-বিলুর শুকনো মুখের কথা মনে পড়ছিল, সেটা একটা কারণ আর হঠাৎ করে হাঁটার চেষ্টা করে পুরো শরীরে ব্যথা— সেটা দ্বিতীয় কারণ।

পরদিন বিকালবেলাতেই আমি বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার বাসায় হাজির হলাম। আমাকে দেখে অনিক খুশি হয়ে বলল, "তুমি এসেছে! ভেরি গুড। আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট কারো ওপর পরীক্ষা করতে হবে। তুমিই হবে সেই গিনিপিগ।"

আমি বললাম, "আমি গিনিপিগ, ইঁদুর, আরশোলা সব কিছু হতে রাজি আছি কিন্তু তার বদলে তোমার একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কী কাজ ?"

"একজন কবি, তার নাম কিংকর চৌধুরী, সে আমাদের খুব উৎপাত করছে। তাকে আচ্ছামতো সাইজ করে দিতে হবে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "কবি আবার কীভাবে উৎপাত করে ?"

আমি তখন তাকে কবি কিংকর চৌধুরীর পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম, শুনে অনিক মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই বলেছ, এ তো মহাঝামেলার ব্যাপার।"

"এখন তাহলে বলো তাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়।"

অনিক মাথা চুলকে বলল, "কীভাবে তুমি শায়েস্তা করতে চাও ?"

"সেটা আমি কেমন করে বলব ? তুমি হচ্ছ বিজ্ঞানী, তুমি বলো কী করা যায়।"

অনিক তবুও মাথা চুলকায়, বলে, "ইয়ে— কিন্তু—"

আমি বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয় ?"

"কী কাজ ?"

"এমন একটা ওষুধ বের করো যেটা খেলে তার সাইজ ছোট হয়ে যাবে।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "সাইজ ছোট হয়ে যাবে ? কত ছোট ?"

"এই মনে করো ছয় ইঞ্চি।"

"ছয় ইঞ্চি ?"

"হ্যাঁ, তাহলে তাকে আমি একটা বোতলে ভরে দশজনকে দেখাতে পারি, চাই কি সার্কাসে বিক্রি করে দিতে পারি।"

অনিক মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহুঁ। এটা সম্ভব নয়। একটা আস্ত মানুষকে কেমন করে তুমি ছয় ইঞ্চি সাইজ করবে।"

"তাহলে কি কোনমতে তার মাথায় এক জোড়া শিং গজিয়ে দেয়া যাবে ? গরুর মতো শিং। সেটা যদি একান্তই না পারা যায় তাহলে অন্তত ছাগলের মতো এক জোড়া শিং ?"

অনিক চিন্তিত মুখে কী একটা ভাবে তারপর আমতা আমতা করে বলে, "ইয়ে সেটা যে খুব অসম্ভব তা না। জিনেটিক্সের ব্যাপার। কোন জিনটা দিয়ে শিং গজায় মোটামুটিভাবে আলাদা করা আছে। সেটাকে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে একটা রেট্রো ভাইরাসে ট্রান্সপ্লান্ট করে তখন যদি—"

আমি বিজ্ঞানের কচকচি কিছুই বুঝতে পারলাম না, চেষ্টাও করলাম না, অন্য একটা আইডিয়া দেয়ার চেষ্টা করলাম, "তাহলে কি তুমি একটা লেজ গজিয়ে দিতে পারবে ? ছোটখাটো লেজ না— মোটাসোটা লম্বা একটা লেজ, যেটা লুকিয়ে রাখতে পারবে না ?"

অনিক আবার চিন্তিত মুখে মাথা চুলকাতে থাকে, বলে, "একেবারে অসম্ভব তা না, কিন্তু অনেক রিসার্চ দরকার। মানুষের ওপর এইরকম গবেষণা করার অনেক ঝামেলা।"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "তাহলে আমাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও যেন কবি ব্যাটাকে সাইজ করতে পারি।"

অনিক বলল, "আমাকে একটু সময় দাও জাফর ইকবাল। আমি একটু চিন্তা করি। তোমার এত তাড়াহুড়ো কিসের ?" অনিক সুর পাল্টে বলল, "তোমার ব্যায়ামের কী খবর ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "নাহ! ব্যায়ামের খবর বেশি ভাল না।" মাথা নাড়ার পরও আউক করে শব্দ করতে হলো না, সেটা একটা ভাল লক্ষণ। ঘাড়ের ব্যথাটা একটু কমেছে।

"কেন ? খবর ভাল না কেন ?"

আমি হেঁটে শিউলির বাসায় যাবার পর আমার কী অবস্থা হয়েছিল সারা শরীরে এখনো কেমন টনটনে ব্যথা সেটা অনিককে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলাম, ভেবেছিলাম শুনে আমার জন্যে তার মায়া হবে। কিন্তু হলো না, উল্টো মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি তো মহা ফাঁকিবাজ দেখি। একদিন দশ মিনিট হেঁটেই একশ' রকম কৈফিয়ত দেয়া শুরু করেছে!"

আমি বললাম, "ফাঁকিবাজ বলো আর যাই বলো আমি প্রতিদিন এক ঘণ্টা হাঁটতে পারব না।" মুখ শক্ত করে বললাম, "আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"তাহলে ?"

"দরকার হলে বোকাসোকা দেখে একটা বউ বিয়ে করে নেব। স্ট্রোক হবার পর যখন বিছানায় পড়ে থাকব, তখন নাকের মাঝে একটা নল ঢুকিয়ে সে খাওয়াবে।"

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে কেমন জানি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "তুমি এত বড় বিজ্ঞানী, তুমি এরকম কিছু আবিষ্কার করতে পারো না— একটা ছোট ট্যাবলেট সেটা খেলেই শরীর নিজে থেকে ব্যায়াম করতে থাকবে!"

অনিক কেমন যেন চমকে উঠে বলল, "কী বললে ?"

আমি বললাম, "বলেছি যে তুমি একটা ট্যাবলেট আবিষ্কার করবে সেটার নাম দেবে ব্যায়াম বটিকা। সেটা খেয়ে আমি শুয়ে থাকব। আমার হাত-পা নিজে থেকে নড়তে থাকবে, ব্যায়াম করতে থাকবে, আমার কিছুই করতে হবে না!"

অনিক কেমন যেন চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি শুয়ে থাকবে আর তোমার শরীর ব্যায়াম করতে থাকবে ? হাত-পা-ঘাড়-মাথা সব কিছু ?"

"হ্যাঁ। তাহলে আমাদের মতো মানুষের খুব সুবিধে হয়। মনে করো—"

অনিক হাতে কিল দিয়ে বলল, "ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া!"

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, "এরকম অনেক আইডিয়া আছে আমার মাথায়। যেমন মনে করো গভীর রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়, খুব বাথরুম পেয়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠতেও ইচ্ছা করে না আবার না গেলেও না। তাই যদি বিছানার সাথে একটা বাথরুম ফিটিং লাগিয়ে দেয়া যায় যেন শুয়ে শুয়েই কাজ শেষ করে ফেলা যায়।"

আমি আরেকটু বিস্তারিত বলতে যাচ্ছিলাম অনিক বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও আগেই অন্য কিছু বলো না। আগে শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করার ব্যাপারটা শেষ করি। তুমি চাইছ তোমার হাত-পা-ঘাড়-মাথা এগুলোর ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এগুলো নিজে নিজে ব্যায়াম করবে, নড়তে থাকবে, ছুটতে থাকবে ?"

"হ্যাঁ।"

"হার্ট পাম্প করবে ? ফুসফুসের ব্যায়াম হবে ?"

"হ্যাঁ।"

"সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন হবে ?"

অনিক কঠিন কঠিন কী বলছে আমি পুরোপুরি না বুঝলেও মাথা নেড়ে বলাম, "হ্যাঁ।" অনিক চকচকে চোখে আমার দিকে মাথা এগিয়ে এনে বলল, "তুমি একটা জিনিস জানো ?"

"কী ?"

"তুমি যার কথা বলছ সেটা আমার কাছে আছে!"

"তোমার কাছে আছে ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি এর মাঝে ব্যায়াম বটিকা আবিষ্কার করে ফেলেছ ?"

"ঠিক ব্যায়াম বটিকা না, কারণ জিনিসটা তরল, বোতলে রাখতে হয়। এক চামচ খেলে মস্তিষ্ক নার্ভের ওপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেয়। আমাদের হাত-পা এসব নাড়ানোর জন্যে যে ইম্পালস আসে সেটা ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল। এই তরলটা স্থানীয়ভাবে সেই ইম্পালস তৈরি করে। শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্সটা খুব জরুরি।" অনিক উৎসাহে টগবগ করতে করতে একটা কাগজ টেনে এনে বলল, "তোমাকে বুঝিয়ে দেই কীভাবে কাজ করে ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, না, খামখা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমি বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না। কীভাবে কতটুকু খেতে হবে বলে দাও।"

অনিক অবাক হয়ে বলল, "কতটুকু খেতে হবে মানে? কে খাবে?"

"আমি।"

"তুমি খাবে মানে? এখনো ঠিক করে পরীক্ষা করা হয় নাই। আগে জন্তু-জানোয়ারের ওপর টেস্ট করতে হবে, তারপর অল্প ডোজে মানুষের ওপরে।"

আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, "জন্তু-জানোয়ার দরকার নেই, সরাসরি মানুষের ওপরে টেস্ট করতে পারবে! একটু আগেই না তুমি বললে আমাকে তোমার গিনিপিগ বানাবে? আমি গিনিপিগ হবার জন্যে রেডি।"

অনিক মাথা নাড়ল, বলল, "না না তোমাকে গিনিপিগ হতে বলেছিলাম অন্য একটা আবিষ্কারের জন্যে— দ্বিমাত্রিক একটা ছবিকে ত্রিমাত্রিক দেখা যায় কিনা সেটা টেস্ট করব ভেবেছিলাম।"

"দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক এসব কঠিন কঠিন জিনিস পরে হবে। আগে আমাকে ব্যায়াম বটিকা দাও! ও আচ্ছা এটা তো ট্যাবলেট না। এটাকে ব্যায়াম বটিকা বলা যাবে না। ব্যায়াম মিকচার বলতে হবে। ঠিক আছে তাহলে ব্যায়াম মিকচারই দাও। খেতে কী রকম? বেশি তেতো না তো? আমি আবার তেতো জিনিস খেতে পারি না।"

অনিক বলল, "খেতে কী রকম সেটা তো জানি না। মনে হয় একটু নোনতা ধরনের মিষ্টি হবে। অনেকটা খাবার স্যালাইনের মতো।"

"গুড!" আমি সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লাম, "দেখতে কী রকম? টকটকে লাল হলে সবচেয়ে ভাল হয়। কিংবা গোলাপি।"

অনিক একটু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তোমার কৌতূহল তো দেখি উল্টাপাল্টা জায়গায়। দেখতে কীরকম খেতে কীরকম এটা নিয়ে কে মাথা ঘামায়!"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তোমরা বিজ্ঞানীরা এসব জিনিস নিয়ে মাথা না ঘামাতে পারো, আমরা সাধারণ মানুষেরা এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাই। বলো, কী রঙ?"

"কোন রঙ নেই। একেবারে পানির মতো স্বচ্ছ।"

"কোন রঙ নেই?" আমি রীতিমতো হতাশ হলাম। "এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসের কোন রঙ থাকবে না কেমন করে হয়? এটাতে একটা রঙ দিতেই হবে। আমার ফেবারিট হচ্ছে লাল। টকটকে লাল।"

অনিক হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, সেটা পরে দেখা যাবে। এক ফোঁটা খাবারের রঙ দিয়ে লাল করে দেয়া যাবে।"

"এখন তাহলে বলো কখন খাব? কীভাবে খাব?"

অনিক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি সত্যিই এটা খেতে চাও?"

"হ্যাঁ। খেয়ে যদি মরে টরে যাই তাহলে খেতে চাই না—"

"না। মরবে কেন? এটার মাঝে বিষাক্ত কিছু নেই। আধঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভেতর শরীর পুরোটা মেটাবলাইজ করে নেবে।"

আমি উৎসাহে সোজা হয়ে বসে বললাম, "দাও তাহলে এখনি দাও। খেয়ে দেখি।"

"না। এখন না।" অনিক মাথা নেড়ে বলল, "যদি সত্যিই খেতে চাও বাসায় গিয়ে শোয়ার ঠিক আগে খাবে। ঠিক এক চামচ— বেশি না।"

"বেশি খেলে কী হবে?"

"বেশি খাওয়ার দরকার কী? নতুন একটা জিনিস পরীক্ষা করছি, রয়ে সয়ে করা ভাল না?"

"ঠিক আছে। বলো তাহলে—"

অনিক বলল, "খেয়ে সাথে সাথে বিছানায় শুয়ে পড়বে। মিনিট দশেক পরে দেখবে তোমার হাত-পা তুমি নাড়াতে পারছ না, কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ দেখবে সেগুলো নিজে থেকে নড়তে শুরু করেছে। কখনো ডানে কখনো বামে সামনে পিছে। দেখতে দেখতে হার্টবিট বেড়ে যাবে, শরীরের ব্যায়াম হতে থাকবে।"

"সত্যি?" দৃশ্যটা কল্পনা করেই আনন্দে আমার হার্টবিট বেড়ে যায়।

"হ্যাঁ। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আধাঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাঝে আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

"ভেরি গুড।" আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "এখনি দাও আমার ব্যায়াম মিকচার!"

অনিক ভেতরে ঢুকে গেল, খানিকক্ষণ কিছু জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা খাবার পানির প্লাস্টিকের বোতলে করে সেই বিখ্যাত আবিষ্কার নিয়ে এলো। আমি বললাম, "কী হলো? তুমি না বলেছিলে এটাকে লাল রঙ করে দেবে?

অনিক হাত নেড়ে পুরো বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বলল, "তুমি একজন বয়স্ক মানুষ, লাল রঙ গোলাপি রঙ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? রঙটা তো ইম্পরট্যান্ট না—"

আমার মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল কিন্তু এখন আর তাকে চাপ দিলাম না। বোতলটা হাতে নিয়ে ছিপি খুলে শুঁকে দেখলাম, ভেবেছিলাম তীব্র একটা ঝাঁঝালো গন্ধ হবে কিন্তু সেরকম কিছু নয়। আমার আরও একটু আশাভঙ্গ

হলো, এরকম সাংঘাতিক একটা জিনিস যদি টকটকে লাল না হয়, ভয়ঙ্কর ঝাঁঝালো গন্ধ না থাকে, মুখে দিলে টক-টক মিষ্টি একটা স্বাদ না হয় তাহলে কেমন করে হয়? বিজ্ঞানীরা মনে হয় কখনোই একটা জিনিসের সত্যিকার গুরুত্বটা ধরতে পারে না।

আমি প্লাস্টিকের বোতলটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "যাই।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"বাসায়। গিয়ে আজকেই টেস্ট করতে চাই।"

"কী হলো আমাকে জানিও।"

"জানাব।"

অনিকের বাসা থেকে বের হয়ে একটা রিকশা নিয়ে মাত্র অল্প কিছু দূর গিয়েছি তখন দেখি রাস্তার পাশে একটা ফাস্টফুডের দোকান। দোকানের সাইনবোর্ডে বিশাল একটা হ্যামবার্গারের ছবি, টসটসে রসালো একটা হ্যামবার্গার, নিশ্চয়ই মাত্র তৈরি করা হয়েছে, গরম একটা ভাপ বের হচ্ছে। ছবি দেখেই আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি রিকশা থামিয়ে ফাস্টফুডের দোকানে নেমে গেলাম।

হ্যামবার্গারটা খেতে ভাল, প্রথমটা খাবার পর মনে হলো খিদেটা আরও চাগিয়ে উঠল, একটা খাবার দোকানে এসে তো আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে যেতে পারি না তাই দ্বিতীয় হ্যামবার্গারটা অর্ডার দিতে হলো। যখন সেটা আধাআধি খেয়েছি তখন হঠাৎ আমার বিলু-মিলুর কথা মনে পড়ল। কবি কিংকর চৌধুরীর উৎপাতে এখন তাদের মাছ-মাংস ডিম খাওয়া বন্ধ, ঘাস-লতা-পাতা খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে। তাদেরকে নিয়ে এলে এখানে আমার সাথে হ্যামবার্গার খেতে পারত। নিয়ে যখন আসিনি তখন আর দুঃখ করে কী হবে ভেবে চিন্তাটা মাথা থেকে প্রায় দূর করে দিচ্ছিলাম তখন মনে হলো এখান থেকে তাদের জন্যে দুটি হ্যামবার্গার কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়? সাথে কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই? আমি আর দেরি করলাম না, কাউন্টারে গিয়ে বললাম, "আরও দুটি হ্যামবার্গার।"

কাউন্টারে কমবয়সী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ কপালে তুলে বলল, "আরও দুটি হ্যামবার্গার খাবেন?"

আমি বললাম, "আমি খাব না। সাথে নিয়ে যাব।"

মেয়েটা খুব সাবধানে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে আমার জন্যে হ্যামবার্গার আনতে গেল।

শিউলির বাসায় গিয়ে দরজার বেল টিপতেই মিলু দরজা খুলে দিল। তার মুখ শুকনো, আমাকে দেখেও খুব উজ্জ্বল হলো না। আমি বললাম, "কী রে মিলু, কী খবর?"

মিলু একটা নিঃশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বলল, "খবর ভাল না।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কবি কাকু এখানে চলে এসেছে।"

"এখানে চলে এসেছে মানে?"

"এখন থেকে আমাদের বাসায় থাকবে।"

আমি চোখে কপালে তুলে বললাম, "বলিস কী তুই?"

মিলু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, শিউলিকে দেখে থেমে গেল। শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইয়া। কখন এসেছ? তোমার হাতে কিসের প্যাকেট?"

"হ্যামবার্গার। মিলু-বিলুর জন্যে এনেছি।"

শিউলি বলল, "আমাদের বাসায় আমরা মাছ-মাংস বন্ধ রাখার চেষ্টা করছি—"

আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, "তোর ইচ্ছা হলে মাছ-মাংস কেন লবণ পানি এসবও বন্ধ রাখ। দরকার হলে নিঃশ্বাস নেয়াও বন্ধ রাখ। কিন্তু এই ছোট বাচ্চাদের কষ্ট দিতে পারবি না।"

"কষ্ট কেন হবে? অভ্যাস হয়ে গেলে—"

"তোদের ইচ্ছে হলে যা কিছু অভ্যাস করে নে। লোহার শিক গরম করে তালুতে ছ্যাঁকা দেয়া শুরু কর। দেখবি কয়দিন পরে অভ্যাস হয়ে যাবে!"

আমার কথা শুনে বিলুও বের হয়ে আসছে, তার মুখও শুকনো। আমি হ্যামবার্গারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নে খা।"

মিলু আর বিলু হ্যামবার্গারের প্যাকেটটা নিয়ে ছুটে নিজেদের ঘরে চলে গেল। আহা বেচারারা! কতদিন না জানি ভালমন্দ কিছু খায়নি। আমি শিউলিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর কবি নাকি এই বাসায় উঠে এসেছে? মনে আছে আমি তোকে কী বলেছিলাম? কবি-সাহিত্যিক থেকে একশ' হাত দূরে থাকবি? সুযোগ পেলেই এরা বাড়িতে উঠে আসে! আর একবার উঠলে তখন কিছুতেই সরানো যায় না!"

শিউলি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স আস্তে ভাইয়া, কিংকর ভাই শুনবেন!"

"শুনুক না! আমি তো শোনার জন্যেই বলছি। কোথায় তোর কিংকর ভাই?" বলে আমি শিউলির জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই তাকে খুঁজতে লাগলাম। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না, তাকে ড্রয়িংরুমে পেয়ে গেলাম, ধবধবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে সোফায় পা তুলে বসে আছে। এক হাতে একটা কাগজ আরেক হাতে একটা কলম, চোখে-মুখে গভীর এক ধরনের ভাব। আমাকে দেখে মনে হলো একটু চমকে উঠল। আমি তার পাশে বসলাম, হাতে অনিকের আবিষ্কারের বোতলটা ছিল, সেটা টেবিলে রাখলাম। কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "আঁ-আঁ-আঁপনি?"

"হ্যাঁ। আমি।"

"এঁত রাঁতে এঁখানে কী মঁনে কঁরে?"

"শিউলি আমার বোন। নিজের বোনের বাসায় আমি যখন খুশি আসতে পারি! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি এখানে এত রাতে কী মনে করে?"

কবি কিংকর চৌধুরী আমার কথা শুনে একটু রেগে গেল বলে মনে হলো। কিছুক্ষণ আমার দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "শিঁউলি আঁর শঁরীফ অঁনেক দিঁন থেঁকে আঁমাকে থাঁকতে বঁলেছে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "মনে হয় না। শিউলি আর শরীফ দুজনই একটু হাবা টাইপের, কিন্তু এত হাবা না—"

আমি কথা শেষ করার আগেই শিউলি এসে ঢুকল। বলল, "যাও ভাইয়া ভেতরে যাও। হাত-মুখ ধুয়ে আসো। টেবিলে খাবার দিয়েছি।"

আমি বললাম, "আমাকে বোকা পেয়েছিস নাকি যে তোর বাসায় ঘাস-লতা-পাতা খাব? আমি খেয়ে এসেছি?"

"কী খেয়ে এসেছ?"

"দুটি হামবার্গার। শুধু খেয়ে আসিনি মিলু-বিলুর জন্যে নিয়েও এসেছি।"

"তাই তো দেখছি!" শিউলি মুখ শক্ত করে বলল, "ঠিক আছে হাত-মুখ ধুয়ে আমাদের সাথে বসো।"

বুঝতে পারলাম আমাকে কবি কিংকর চৌধুরী থেকে দূরে সরাতে চায়। আমি আর ঝামেলা করলাম না, ভেতরে গেলাম বিলু-মিলুর সাথে কথা বলতে।

দুজনে খুব শখ করে হামবার্গার খাচ্ছে। সস একেবারে কানের লতিতে লেগে গিয়েছে। আমাকে দেখে খেতে খেতে বিলু বলল, "গাবা গাবা গাবা।"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "মুখে খাবার নিয়ে কথা বলিস না গাধা, খাওয়া শেষ করে কথা বল।"

বিলু মুখের খাবার শেষ করে বলল, "তুমি বলেছিলে কবি কাকুকে খুন করবে।"

মিলু বলল, "উল্টো কবি কাকু এখন আমাদের খুন করে ফেলবে।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"কী হয় নাই বলো? আমাদের কথা শুনলে নাকি কবি কাকুর ডিস্টার্ব হয়। তাই আমাদের ফিসফিস করে কথা বলতে হয়।"

বিলু বলল, "টেলিভিশন পুরো বন্ধ।"

মিলু বলল, "আমার প্রিয় কমিকগুলো পুরনো কাগজের সাথে বেচে দিয়েছে।"

আমি রাগ চেপে বললাম, "আর শিউলি এগুলো সহ্য করছে?"

"সহ্য না করে কী করবে? কবি কাকুর মেজাজ খারাপ হলে যা তা বলে দেয়।"

মিলু একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলল, "এখন বাসায় সবাই কবি কাকুকে ভয় পায়।"

"ভয় পায়? আমি রেগে-মেগে বললাম, "এখন এই মানুষটাকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেয়া দরকার।"

মিলু বলল, "মামা যেটা পারবে না সেটা বলে লাভ নেই। তোমার সেই সাহস নাই, তোমার গায়ে সেই জোরও নাই।"

"আমার জোর নাই? শুধু অপেক্ষা করে দেখ কয়দিন, আমার শরীর হবে লোহার মতো শক্ত?"

"কীভাবে?"

"এমন ব্যায়াম করার ওষুধ পেয়েছি—" কথাটা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ল অনিকের দেয়া ব্যায়াম মিকশ্চারটা ড্রয়িংরুমে কবি কিংকর চৌধুরীর কাছে রেখে এসেছি। আমি কথা শেষ না করে প্রায় দৌড়ে ড্রয়িংরুমে গেলাম, গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। কবি কিংকর চৌধুরী আমার বোতলটা খুলে ঢকঢক করে ব্যায়াম মিকশ্চার খাচ্ছে। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম পুরো বোতলটা শেষ করে সে খালি বোতলটা টেবিলে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। আমি তার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বললাম, "আ-আ-আপনি এটা কী খেলেন?"

"খাঁবার স্যাঁলাইন?"

"খাবার স্যালাইন?"

"হ্যাঁ। শিঁউলিকে বঁলেছি দিঁতে। আঁমাকে তৈঁরি কঁরে দিঁয়েছে। খেঁলে শঁরীর ঝঁরঝরে থাঁকে।" বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। সেই

দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়া অবস্থা। অনিক আমাকে বলেছে এক চামচ খেতে আর এই লোক পুরো বোতল শেষ করে ফেলেছে। এখন কী হবে?

আমি ঠিক করে চিন্তা করতে পারছিলাম না, এর মাঝে শিউলি এসে বলল, "খেতে আসেন কিংকর ভাই। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।"

কবি কিংকর চৌধুরী বলল, "চলো। বলে সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কেমন যেন টলে ওঠে, কোনভাবে সোফায় হাতল ধরে নিজেকে সামলে নেয়।

শিউলি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হলো?"

"নাঁ কিঁছু নাঁ।" কবি কিংকর চৌধুরী মাথা নেড়ে বলল, "হঁঠাৎ মাঁথাটা এঁকটু ঘুঁরে উঁঠল।"

শিউলি বলল, "একটু বসে নেবেন কিংকর ভাই?"

"নাঁ নাঁ। কোঁনো প্রঁয়োজন নেঁই।" বলে কিংকর চৌধুরী হেঁটে হেঁটে খাবার টেবিলে গেল। তার জন্যে আলাদা চেয়ার রাখা হয়েছে, সেখানে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে। আমি চোখ বড় বড় করে তাকে লক্ষ্য করি। অনিক বলেছিল তার ব্যায়াম মিকশ্চার কাজ করতে পনের মিনিট সময় নেবে— কিন্তু কেউ যদি চামচের বদলে পুরো বোতল খেয়ে ফেলে তখন কী হবে?"

কিছুক্ষণের মাঝেই অবশ্যি আমি আমারা প্রশ্নর উত্তর পেয়ে গেলাম, আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, কবি কিংকর চৌধুরীর মুখে বিচিত্র প্রায় অপার্থিব এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে এবং হঠাৎ করে তার মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। টেবিল ফ্যানের বাতাস দেওয়ার জন্যে সেটা যেভাবে ঘুরে ঘুরে বাতাস দেয় অনেকটা সেভাবে তার মাথা চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে তার মুখের হাসি বিতরণ করতে শুরু করেছে। দেখে মনে হয় এটা বুঝি তার নিজের মাথা না, কেউ যেন আলাদাভাবে স্প্রিং দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।

পুরো ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক যে শিউলি এবং শরীফ হাঁ করে কবি কিংকর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম শুধু যে তার মাথাটা ঘুরছে তা না, তার কান, নাক, ঠোঁট, গাল, ভুরু সেগুলোও নড়তে শুরু করল। আমি এর আগে কোন মানুষকে তার কান কিংবা নাককে নাড়াতে দেখিনি— গরু-ছাগল কান নাড়ায় সেটাকে দেখতে এমন কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু একজন মানুষ যখন সেগুলো নাড়ায় তখন চোখ ছানাবাড়া হয়ে যাবার অবস্থা। শিউলি কিংবা শরীফ বুঝতে পারছে না— ব্যাপারটা কী ঘটছে, শুধু আমি জানি কী হচ্ছে। কবি কিংকর চৌধুরীর শরীরের ওপর তার নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই। সব এখন নিজে নিজে নড়তে শুরু করছে। এখন নাক কান চোখ

ঠোঁট ভুরু মায় মাথা নড়ছে সেটা বিপজ্জনক কিছু নয় কিন্তু যখন হাত-পা আর শরীর নড়তে থাকবে তখন কী হবে?

শিউলি ভয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকল, "কিংকর ভাই। এই যে কিংকর ভাই— আপনার কী হয়েছে?"

আমি ভাবছিলাম শিউলিকে একটু সাবধান করে দেব কিন্তু তার সুযোগ হলো না। হঠাৎ করে কবি কিংকর চৌধুরীর দুই হাত লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল, কিছু বোঝার আগেই হাত দুটো ধপাস করে টেবিলের ওপর পড়ল। টেবিলে কাচের গ্লাস এবং ডালের বাটি ছিটকে পড়ে পুরো টেবিল পানি এবং ডালে মাখামাখি হয়ে গেল।

শিউলি ভয়ে চিৎকার করে পেছনে সরে এলো, ভাগ্যিস সরেছিল তা না হলে কী হতো বলা মুশকিল। হঠাৎ মনে হলো কবি কিংকর চৌধুরী দুই হাতে তার চারপাশে অদৃশ্য মানুষদের ঘুসি মারতে শুরু করেছেন। তার হাত চলতে থাকে ও ঘুরতে থাকে এবং হাতের আঘাত খেয়ে ডাইনিং টেবিলের খাবার শূন্যে উড়তে থাকে। ডালের বাটি উল্টে পড়ে কবি কিংকর চৌধুরীর সারা শরীর, হাত-মুখ এবং জামা-কাপড় মাখামাখি হয়ে গেল কিন্তু কবি কিংকর চৌধুরীর কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। তার মুখে সারাক্ষণই সেই অপার্থিব মৃদু হাসি।

খাবার টেবিলে হৈচৈ শুনে বিলু আর মিলু ছুটে এসেছে, তারা দৃশ্য দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। আমার দুই হাত ধরে বলল, "কী হয়েছে মামা? কবি কাকু এরকম করছেন কেন?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, "কবিতার ভাব এসেছে মনে হয়!"

বিলু জানতে চাইল, "এভাবে কবিতার ভাব আসে?"

"সাংঘাতিক কোন কবিতা হলে মনে হয় এভাবে আসে।"

মিলু বলল, "একটু কাছে গিয়ে দেখি?"

আমি বললাম, "না না। সর্বনাশ!"

"কেন? সর্বনাশ কেন?"

"এখন পর্যন্ত খালি মুখ আর হাত চলছে। যখন পা চলতে শুরু করবে তখন কেউ রক্ষা পাবে না!"

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমি পা চলার নিশানা দেখতে পেলাম। হঠাৎ করে তার ডান পা-টা শূন্যে উঠে ডাইনিং টেবিলকে একটা লাথি মারল। কিছু বোঝার আগে এরপর বাম পা-টা তারপর দুই পা নাচানাচি করতে লাগল। আমি চিৎকার করে বললাম, "সাবধান, সবাই সরে যাও।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, হঠাৎ করে কবি কিংকর চৌধুরী তিড়িং করে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর তিড়িংবিড়িং করে হাত-পা

ছুড়ে নাচতে শুরু করল। তার পায়ের লাথি খেয়ে শরীফ একপাশে ছিটকে পড়ল এবং উঠে বসার আগেই কবি কিংকর চৌধুরী হাত-পা ছুড়ে বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে নাচানাচি করে শরীফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। তার হাতের আঘাতে প্লেট-থালা-বাসন নিচে পড়ে গেল আর পায়ের লাথি খেয়ে টেবিল-ল্যাম্প, শেলফ, শোকেসের ওপরে সাজানো জিনিসপত্র ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। কবি কিংকর চৌধুরী ডাইনিং রুম থেকে তিড়িংবিড়িং করে নাচতে নাচতে ড্রয়িংরুমে এলো, লাথি মেরে বইয়ের শেলফ থেকে বইগুলো ফেলে দিয়ে মাটিতে একটা ডিগবাজি দিল। কিছুক্ষণ শুয়ে হাত-পা ছুড়ে হঠাৎ আবার লাফিয়ে উঠে, দেয়াল খামচে খামচে টিকটিকির মতো ওপরে ওঠার চেষ্টা করল। সেখানে থেকে ধরাম করে নিচে পড়ে গিয়ে হাত দুটো হেলিকপ্টারের পাখার মতো ঘুরাতে ঘুরাতে ড্রয়িংরুম থেকে লাফাতে লাফতে বেডরুমে ঢুকে গেল। আলনার কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ করে টর্নেডোর মতো ঘুরপাক খেতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে আলনার জামাকাপড়, শাড়ি চারদিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দেখলাম ড্রেসিং টেবিলের ওপরে সাজানো শিউলির পাউডার ক্রিম পারফিউম ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে, সেগুলো ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়।

কবি কিংকর চৌধুরী বিশাল একটা পোকার মতো তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এক ঘর থেকে অন্যঘরে ছোটছুটি করতে লাগল, কখন কোন দিকে যাবে কী করবে তার কোন ঠিক নেই, সবাই নিজের জান বাঁচিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে পুরো বাসা একেবার তছনছ হয়ে গেল।

একজন বয়স্ক সম্মানী মানুষ এভাবে হাত-পা ছুড়ে নেচে কুদে লাফিয়ে সারা বাসা ঘুরে বেড়াতে পারে— সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব না। আমরা সবাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকে থামানো অসম্ভব একটা ব্যাপার, কেউ সে চেষ্টাও করল না। মিনিট দশেক এইভাবে তিড়িংবিড়িং করে শেষপর্যন্ত কিংকর চৌধুরী নিজে থেকেই থেমে গেল। ধপাস করে সোফায় বসে সে তখন লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে। একেবারে পুরোপুরি থেমে গেল সেটাও বলা যায় না কারণ কথা নাই বার্তা নাই মাঝে মাঝে হঠাৎ করে তার একটা হাত বা পা লাফ দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

আমরা ভয়ে ভয়ে কবি কিংকর চৌধুরীকে ঘিরে দাঁড়ালাম। শরীফ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে কিংকর ভাই ?"

"বুঝবার পারলাম না।" কবি কিংকর চৌধুরীর কথায় সেই নাকি ভাবটা চলে গেছে। শুধু যে নাকি ভাবটা চলে গেছে তা নয়, ভাষাটাও কেমন জানি চাচাছোলা অশালীন। কিংকর চৌধুরী এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "শরীলের

উপর কুনো কন্ট্রোল নাই। ঠ্যাং হাত মাথা যেন নিজের মতন লাফায়, হালার বাই হালা দেখি তাজ্জবের ব্যাপার।"

কবি কিংকর চৌধুরীর নর্তন-কুর্দন দেখে যত অবাক হয়েছিলাম তার মুখের ভাষা শুনে আমরা তার থেকে বেশি অবাক হলাম। বিলু আমার হাত ধরে বলল, "মামা! কবি কাকু এইভাবে কথা বলেন কেন ?"

"এইটাই তার অরিজিনাল ভাষা! আমি ফিসফিস করে বললাম, "আসল ভাষাটা এখন বের হচ্ছে। অন্যসময় স্টাইল করে নাকি নাকি কথা বলত।"

কবি কিংকর চৌধুরী ঘ্যাস ঘ্যাস করে বগল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "বুঝলা শিউলি, এমুন আচানক জিনিস আমি বাপের জন্মে দেখি নাই। একেবার ছ্যাড়াব্যাড়া অবস্থা। তুমার ঘরবাড়িতে একটু ডিস্টার্ব দিছি মনে লয়।"

শিউলি মুখ শক্ত করে বলল, "একটু নয়, আমার পুরো বাসা সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

কবি কিংকর চৌধুরী লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তয় জব্বর পরিশ্রম হইছে। খিদাডাও লাগছে ভাল মতন। টেবিলে খাবার লাগাও দেখি। বাসায় আণ্ডা আছে ?"

শিউলি বলল, "না কিংকর ভাই। আমাদের বাসায় এখন যে অবস্থা খাবার ব্যবস্থা করার কোন উপায় নেই। আপনি নিজেই তো করেছেন, নিজেই দেখেছেন!

"তা কথা ভুল বলো নাই। শরীরের মইধ্যে মনে হয় শয়তান বাসা বানছে।"

শিউলি বলল, "আপনি বরং বাসায় চলে যান।"

"বা-বাসায় যাব ?"

"হ্যাঁ।"

কবি কিংকর চৌধুরী ধীরে ধীরে একটু ধাতস্ত হয়েছে, বাসায় যাবার কথা শুনে মনে হয় আরও ধাতস্ত হয়ে গেল। এমনকি আবার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করল, "কিন্তু আজ রাতের কবিতা পাঠের আসর ?"

শরীফ বলল, "আপাতত বন্ধ।"

"বন্ধ ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে কি কাল রাতে ?"

"না-না-না" শিউলি দুই হাত নেড়ে বলল, "কবিতা আপাতত থাকুক। মিলু-বিলুর পেছনে সময় দেয়া হচ্ছে না। আমি ওদের সময় দিতে চাই।"

কবি কিংকর চৌধুরী কিছুক্ষণ শিউলির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমরা সবাই তখন ভয়ে এক লাফে পেছনে সরে গেলাম। শিউলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বিলু, তোর কবি কাকুর ব্যাগটা নিয়ে আয় তো।"

বিলু দৌড়ে তার ব্যাগটা নিয়ে এলো এবং কবি কিংকর চৌধুরী ব্যাগ হাতে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। মনে হয় জন্মের মতোই।"

দরজা বন্ধ করে শিউলি কিছুক্ষণ সারা বাসার দিকে তাকিয়ে থেকে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ভাইয়া, তুমি ঠিকই বলেছ। কবি-সাহিত্যিকদের বইপত্র পড়া ঠিক আছে, কিন্তু তাদের বেশি কাছে যাওয়া ঠিক না।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "একেবারেই না।"

শরীফ চারদিকে তাকিয়ে বলল, "বাসার যে অবস্থা এটা ঠিক করতে মনে হয় এক মাস লাগবে।"

বিলু-মিলু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ আব্বু।"

"চলো সবাই মিলে বাইরে থেকে খেয়ে আসি।"

আমি বললাম, "গুড আইডিয়া। এয়ারপোর্ট রোডে একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে, একেবারে ফাটাফাটি খাবার।"

"মাংস-মুরগি আছে তো ?" শরীফ বলল, "পাগলা কবির পাল্লায় পড়ে ভাল খাওয়া বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর কবিতা লিখে কিংকর চৌধুরী অথচ—"

শিউলি ঠান্ডা গলায় বলল, "এই বাসায় যদি ভবিষ্যতে কখনো কেউ কবি কিংকর চৌধুরীর নাম নেয় তাহলে কিন্তু তার খবর আছে।"

বিলু বলল, "কেন আম্মু কী করবে তাহলে ?"

"কিলিয়ে ভর্তা করে দেব।"

রাতে দুটো হ্যামবার্গার খাবার পরেও আমার পেটে খাসির রেজালা আর চিকেন টিকিয়া খাওয়ার যথেষ্ট জায়গা ছিল। বিলু-মিলুর সাথে খেতে খেতে আমি নিচু গলায় তাদের বললাম, "কেমন দেখলি ?"

বিলু আর মিলু আবক হয়ে বলল, "কী দেখলাম ?"

আমি চোখ মটকে বললাম, "তোদের কী কথা দিয়েছিলাম ? কবি কিংকর চৌধুরী—"

বিলু আর মিলু চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি ? তুমি এটা করেছ ?"

"তোরা কি ভাবছিস এমনি এমনি হয়েছে ?"

শিউলি টেবিলের অন্য পাশ থেকে বলল, "কী হলো ভাইয়া ? তুমি বিলু-মিলুর সাথে কী নিয়ে গুজগুজ করছ ?"

বিলু-মিলু আর আমি একসাথে মাথা নেড়ে বললাম, "না, না, কিছু বলছি না! কিছু বলছি না!"



জলকন্যা

গভীর রাতে টেলিফোনের শব্দ শুনে আমি প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসলাম। টেলিফোনের শব্দের মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক থাকে, মাঝরাতে সেই আতঙ্ক মনে হয় আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমি অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে কোনমতে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।" এবারেও কোন শব্দ নেই। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বিছানায় ফিরে যাব কিনা ভাবছি তখন টের পেলাম টেলিফোনটা উল্টো ধরেছি। আমার মতো মানুষের জন্যে এটা রীতিমতো সমস্যা। বিজ্ঞানী অনিক লুম্বার সাথে দেখা হলে তাকে বলতে হবে এমন একটা টেলিফোন আবিষ্কার করতে যেটার উল্টোসিধে নেই, যে টেলিফোনে দুইদিকেই কানে লাগিয়ে শোনা যাবে আবার দুইদিকেই কথা বলা যাবে।

আপাতত টেলিফোনের ঠিক দিকটাই কানে লাগিয়ে তৃতীয়বারের মতো বললাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশ থেকে একজনের কথা শুনতে পেলাম, বলল, "কী হলো শুধু হ্যালো হ্যালো করছ, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ?"

কী আশ্চর্য! অনিক লুম্বার কথা ভাবছিলাম আর ঠিক তার টেলিফোন এসে হাজির। আমি বললাম, "এত রাতে কী ব্যাপার ?"

"রাত ? রাত কোথায় দেখলে ?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী বলছ তুমি ? চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।"

"ঘুটঘুটে অন্ধকার ?"

"হ্যাঁ।"

অনিক লুম্বা বলল, "তুমি নিশ্চয়ই চোখ বন্ধ করে রেখেছ। চোখ খুলে দেখো।"

আমি তখন আবিষ্কার করলাম যে, গভীর রাত মনে করে আসলেই আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছি। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি সত্যি সত্যি চারদিকে এক ধরনের হালকা আলো। আবছা আবছা এই আলোটা অত্যন্ত বিচিত্র, কখনো



সকালে ঘুম ভাঙেনি বলে ভোরের আলো দিখিনি, তাই আমার কাছে আরও বিচিত্র মনে হয়। অনিক বলল, "চোখ খুলেছ ?"

"আমি আমতা আমতা করে বললাম, "ইয়ে, কয়টা বাজে ?"

"ছয়টা। ঘুটঘুটে মাঝরাত মোটেও না।"

আমি হাই তুলে বললাম, "সকাল ছয়টা আমার কাছে মাঝরাতের সমান।"

অনিক লুম্বা ধমক দিয়ে বলল, "বাজে কথা বলো না।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে বলো।"

"তুমি এক্ষুণি চলে এসো।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "চলে আসব ? আমি ? কোথায় ?"

"আমার বাসায়।"

"কেন কী হয়েছে ?"

"এলেই দেখবে। তাড়াতাড়ি।" বলে আমি কিছু বলার আগেই অনিক টেলিফোন রেখে দিল।

সকালবেলাতে এমনিতেই আমার ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে থাকে, ভালমন্দ কিছুই বুঝতে পারি না। অনিক লুম্বার কথাও বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু ঘুমানোর জন্যে বিছানার দিকে যাচ্ছিলাম তখন আবার টেলিফোন বাজল। আমি আবার ঘুম ঘুম চোখে টেলিফোন ধরে বললাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশে অনিক লুম্বার গলা শুনতে পেলাম, "খবরদার তুমি বিছানায় ফিরে যাবে না কিন্তু। এক্ষুণি চলে এসো, খুব জরুরি।"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই সে অন্যপাশে টেলিফোন রেখে দিয়েছে। বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে পানি দিয়ে ঘুমটা একটু কমানোর চেষ্টা করলাম, খুব একটা লাভ হলো না। কিছু একটা খেলে হয়তো জেগে উঠতে পারি, এত সকালে কী খাওয়া যায় চিন্তা-ভাবনা করছি তখন আবার টেলিফোন বাজল। ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরে কিছু বলার আগেই অন্যপাশ থেকে অনিক লুম্বা বলল, "এখন আবার খেতে বসে যেও না। এক্ষুণি ঘর থেকে বের হও, কুইক।"

আমি কিছু বলার আগেই এবারেও সে আবার টেলিফোন রেখে দিল। আমি তখন বাধ্য হয়ে কাপড়-জামা পরে ঘর থেকে বের হলাম। ভেবেছিলাম এত সকালে নিশ্চয়ই কাকপক্ষী পর্যন্ত ঘুম থেকে ওঠেনি। কিন্তু বাইরে বের হয়ে আমি বেকুব হয়ে গেলাম। বাস চলছে, টেম্পু চলছে, কত রিকশা-স্কুটারে রাস্তা গিজগিজ করছে। মানুষজন ছোটাছুটি করছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! এই দেশের মানুষ কি সকালবেলা শান্তিতে একটু ঘুমাতেও পারে না ? আমি আর দেরি করলাম না। একটা সিএনজি নিয়ে অনিকের বাসায় রওনা দিলাম।

অনিকের বাসার গেট খোলা। বাসার দরজাও খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর কিছু ময়লা কাপড় স্তূপ করে রেখে অনিক গভীর মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, "দেখো জাফর ইকবাল! দেখো।"

ময়লা কাপড়ের স্তূপের মাঝে দেখার কী থাকতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না। কাছে গিয়ে দেখেও কিছু বুঝতে পারলাম না, বললাম, "কী দেখব ?"

ঠিক তখন পুরনো কাপড়ের বান্ডিলের ভেতর কী একটা জানি ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে উঠল, আমি লাফিয়ে পিছনে সরে গিয়ে বললাম, "কী শব্দ করছে ?"

"দেখছ না ? বাচ্চা—"

"বাচ্চা ?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "কিসের বাচ্চা ?"

"কিসের বাচ্চা মানে ?" অনিক বিরক্ত হয়ে বলল, "বাচ্চা আবার কিসের হয় ? মানুষের বাচ্চা।"

"মানুষের বাচ্চা ?" আমি অবাক হয়ে কাছে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি ময়লা কাপড়ের পুঁটলির ভেতরে ছোট একটা মাথা, প্রায় গোলাপি রঙ, সেটা একটু একটু নড়ছে আর মুখ দিয়ে শব্দ করছে। আমি প্রায় বিশ্বাস করেই ফেলেছিলাম যে সত্যি সত্যি মানুষের বাচ্চা, কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, অনিক ঠাট্টা করছে। একজন মানুষের বাচ্চা এত ছোট হতে পারে না, নিশ্চয়ই এটা তার কোন একটা আবিষ্কার, কোন একটা পুতুল বা অন্য কিছু। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "তোমার এই পুতুলের বাচ্চা দেখানোর জন্যে আমাকে এত সকালে ডেকে এনেছ ?"

"পুতুলের বাচ্চা কী বলছ ?" অনিক রেগে বলল, "এটা সত্যিকার মানুষের বাচ্চা।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "দেখো অনিক, আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু এত বোকা না। মানুষের বাচ্চা কখনো এত ছোট হয় না।"

"তুমি কয়টা মানুষের বাচ্চা দেখেছ ?"

"অনেক দেখেছি।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমার ছোটবোন শিউলির যখন মেয়ে হলো আমি কোলে নিয়েছিলাম। আমি কোলে নিতেই আমার ওপর হিসি করে দিয়েছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে—"

"নাই।" অনিক বলল, "মানুষের বাচ্চা জন্মানোর সময় এইরকম ছোটই থাকে, তুমি ভুলে গেছ। এই দেখো—"

অনিক ময়লা কাপড়ের পুঁটলিটা একটু আগলা করল। এখন আমি ছোট ছোট হাত-পা দেখতে পেলাম। সেগুলো আঁকুপাকু করে নড়ছে। নাভিটা নিশ্চয়ই কাঁচা— দেখে মনে হয় সেখানে কী একটা যেন ঝুলে আছে। অনিক তাড়াতাড়ি

আবার কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে ফেলল। আমি কয়েকবার চেষ্টা করে বললাম, "তুমি কোথায় পেলে বাচ্চাটাকে ?"

"বারান্দায়।"

"বা-বারান্দায় ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বারান্দায় বাচ্চা কোথা থেকে এলো ?"

"সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। সেইজন্যেই তো তোমাকে ডেকে এনেছি।"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "আ-আমি তোমাকে বলতে পারব ?"

"হয়তো পারবে না। কিন্তু দুজন থাকলে একটু কথা বলা যায়। একটু পরামর্শ করা যায়। একটা ছোট বাচ্চা, তার ভালমন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে না ?"

"আছে।" আমি মাথা নাড়লাম. "তার ভালমন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে। তবে—"

অনিক ভুরু কুঁচকে বলল, "তবে কী ?"

"একটা ছোট বাচ্চা যার কাছে চলে আসে, তার কোন ভাল নেই। তার শুধু মন্দ।"

"তুমি কী বলতে চাইছ ?"

"ছোট বোন শিউলিকে দেখেছিলাম। তার প্রথম বাচ্চা হবার পর খাওয়া নেই ঘুম নেই। কেমন যেন পাগলি টাইপের হয়ে গেল। এখনো ঠিক হয়নি।"

অনিক ছোট বাচ্চাটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "সেটা পরে দেখা যাবে। এখন কী করা যায় বলো।"

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম, "এর মা-বাবাকে খুঁজে বের করে তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে।"

"এর মা-বাবা যদি বাচ্চাটাকে নিজের কাছে রাখতই তাহলে আমার বারান্দায় কেন ফেলে গেল ?"

আমি আবার মাথা চুলকালাম। কোন একটা সমস্যায় পড়লেই আমার মাথা চুলকাতে হয়। আমার কপাল ভাল। আমার জীবনে খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার নেই। সমস্যাও কম, তা না হলে মাথা চুলকানোর কারণে এতদিনে সেখানকার সব চুল উঠে যেত। অনিক বলল, "এই ময়লা কাপড় দিয়ে বাচ্চাটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে, তার মানে এর মা-বাবা নিশ্চয়ই গরিব।"

"তাই বলো। আমি আরও ভাবছিলাম তুমি এত ছোট বাচ্চাকে কেন এত ময়লা কাপড় দিতে পেঁচিয়ে রেখেছ।"

"আমি রাখি নাই।"

"তাহলে খুলে রাখছ না কেন ?"

"বাচ্চাটার মাত্র জন্ম হয়েছে। একটা বাচ্চা থাকে মায়ের পেটে, সেখানে শরীরের গরমটুকু থাকে। যখন জন্ম হয় তখন বাইরের পৃথিবী তার কাছে কনকনে ঠাণ্ডা। তাই তাকে গরম করে রাখতে হয়।"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "তুমি কেমন করে জানো ?"

"বাচ্চাটা পাবার পর আমি কি বসে আছি মনে করেছ ? ইন্টারনেটে ছোট বাচ্চা সম্বন্ধে যা পাওয়া যায় সব ডাউনলোড করে পড়া শুরু করে দিয়েছি না ?"

আমি দেখলাম তার টেবিলের আশেপাশে কাগজের স্তূপ। অনিক বলল, "আমি এর মাঝে ছোট বাচ্চার একটা এক্সপার্ট হয়ে গেছি। তুমি জানো একটা ছোট বাচ্চার যখন জন্ম হয়, তখন প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা সে অনেক কিছু করতে পারে, যেটা পরে করতে পারে না। হাত দিয়ে ধরে ফেলতে পারে, মুখ ভ্যাংচাতে পারে—"

"মুখ ভ্যাংচাতে পারে ?"

অনিক হাসল, বলল, "অনুকরণ করতে পারে। আমি জিব বের করলে সেও জিব বের করবে। কিন্তু বাচ্চাটা বেশির ভাগ সময় চোখ বন্ধ রাখছে।"

অনিকের কথা শুনেই কিনা কে জানে বাচ্চাটা ঠিক তখন দুই চোখ খুলে ড্যাবড্যাব করে তাকাল। অনিক বাচ্চাটার কাছে মুখ নিয়ে নিজের জিব বের করতেই এইটুকুন ছোট বাচ্চা তার লাল টুকটুকে জিব বের করে অনিককে ভেংচি কেটে দিল। অনিক জিবটা ভেতরে ঢোকাতেই বাচ্চাও তার জিব ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। অনিক আবার জিবটা বের করতেই এই টুকুন গ্যাদা বাচ্চা আবার তার জিবটা বের করে ফেলল! কী আশ্চর্য ব্যাপার।

অনিক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ ? দেখেছ ব্যাপারটা ? ঠিক যেটা বলেছিলাম। জন্ম হবার পর পর ছোট বাচ্চাদের অসম্ভব কিছু রিফ্লেক্স থাকে। মাঝে মাঝে এ সময় এরা খপ করে ধরে ফেলতে পারে।"

অনিক তখন তার একটা আঙুল বাচ্চাটার সামনে নাড়াতে থাকে এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সত্যি সত্যি বাচ্চাটা খপ করে আঙুলটা ধরে ফেলল। অনিক আনন্দে দাঁত বের করে হেসে বলল, "দেখেছ ব্যাপারটা ? দেখেছ ?"

আমি বললাম, "দেখেছি। কিন্তু—"

অনিক আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কী ?"

"তোমার বাসার বারান্দায় একটা গেদা বাচ্চা পাওয়া গেছে, সেটা নিয়ে তুমি কিছু একটা করবে না ?"

"সেই জন্যেই তো তোমাকে ডেকে এনেছি। কী করতে হবে তুমি করো। আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করি। বইপত্রে যে সব কথা লিখেছে সেগুলি সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখি।"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "অনিক তুমি গবেষণা করার অনেক সময় পাবে। আগে ব্যাপারটা কাউকে জানাও।"

অনিক বাচ্চাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজের মাথাটা একবার বামে। আরেকবার ডানে নিয়ে বলল, "উহুঁ গবেষণা করার অনেক সময় পাব না। বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর প্রথম কয়েক ঘণ্টা তাদের এরকম রিফ্লেক্স থাকে। একটু পরে আর থাকবে না।"

আমি বললাম, "তাহলে তুমি কী করতে চাও ?"

"বাচ্চাটা চোখ দিয়ে ট্র্যাক করতে পারে কিনা দেখছি।"

আমি বুঝতে পারলাম অনিক এখন কিছুই করবে না, সে তার গবেষণা করে যাবে। যা করার আমাকেই করতে হবে এবং প্রায় সাথে সাথে আমার মনে পড়ল, আমি নিজে নিজে কোন কাজই করতে পারি না। খাওয়া এবং ঘুমের বাইরে জীবনে কোন কাজ নিজে করেছি বলে মনে পড়ে না।

ঠিক এরকম সময় আমার সুব্রতের কথা মনে পড়ল। সুব্রতের জন্ম হয়েছে এই ধরনের কাজের জন্যে! আমি অনিকের টেলিফোন দিয়ে সুব্রতকে ফোন করলাম। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর সুব্রত এসে ফোন ধরল, ঘুম ঘুম গলায় বলল, "হ্যালো।"

আমি বললাম, "সুব্রত, আমি জাফর ইকবাল।"

"জাফর ইকবাল ?" সুব্রত অবাক হয়ে বলল, "তুই এত ভোরে কী করছিস ?"

"একটা জরুরি কাজে—"

"জরুরি কাজ ? তোর আবার জরুরি কাজ কী হতে পারে ? ঘুমাতে যা।"

আমি বললাম, "না, না সুব্রত ঠাট্টা নয়। আসলেই জরুরি কাজ।"

"কী হয়েছে ?"

আমি তখন সুব্রতকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। শুনে সুব্রত চেঁচিয়ে উঠে বলল, "বলিস কী তুই ?"

আমি বললাম, "ঠিকই বলছি। এই এতটুকুন একটা বাচ্চা। গোলাপি রঙের। এই এতটুকুন হাত-পা। এতটুকুন আঙুল।"

"কী আশ্চর্য!"

"আসলেই আশ্চর্য। এখন কী করতে হবে বল।"

"পুলিশে জিডি করতে হবে।"

"জিডি ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "সেটা আবার কী জিনিস ?"

"জেনারেল ডায়েরি।"

"সেটা কেমন করে করতে হয় ?"

"থানায় গিয়ে করতে হয়।"

"থানায় ?" আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, থানা এবং পুলিশ থেকে আমি সব সময় একশ' হাত দূরে থাকতে চাই।

"হ্যাঁ।" সুব্রত বলল, "থানায় যেতে হবে। তবে তুই একা একা যাস না, কী বলতে কী বলে ফেলে আরও ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবি। আমি আসছি।"

সুব্রতের কথা শুনে আমি একটু ভরসা পেলাম, কিন্তু তবুও ভান করলাম আমি যেন একাই করে ফেলতে পারব। বললাম, "তোর আসতে হবে না। আমি একাই বিডি করে ফেলব।"

"বিডি না গাধা, জিডি। তোর একা করতে হবে না। আমি আসছি— তুইও থানায় চলে আয়।"

সুব্রত টেলিফোনটা রেখে দেবার পর আমি আবার অনিকের দিকে তাকালাম। সে হাতে একটা ছোট টর্চলাইট নিয়ে ছোট বাচ্চাটার সামনে লাফালাফি করছে। আমি বললাম, "অনিক, আমি থানায় জিডি করিয়ে আসি।"

"যাও।" বলে সে আবার আগের মতো ছোট ছোট লাফ দিতে লাগল। আমি আগেও দেখেছি অনিক একটা টিকটিকির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। আর এটা তো টিকটিকি না— এটা একটা মানুষের বাচ্চা।

আমি থানার সামনে গিয়ে সুব্রতের খোঁজে ইতিউতি তাকাতে লাগলাম। তার এখনো দেখা নেই, তাকে ছাড়া একা একা আমার ভেতরে ঢোকার কোন ইচ্ছা নেই কিন্তু থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটা আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল। পুলিশ হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেই আমি নার্ভাস হয়ে যাই আর যখন কটমট করে তাকায়, তখন তো কথাই নেই, আমার রীতিমতো বাথরুম পেয়ে যায়। আমি থানার সামনে থেকে সরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই পুলিশ বাজখাঁই গলায় হাঁক দিল, "এই যে, এই যে মোটা ভাই।"

তুলনামূলকভাবে আমার স্বাস্থ্য একটু ভাল কিন্তু এর আগে আমাকে কেউ মোটা ভাই ডাকে নাই। আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "আমাকে ডেকেছেন ?"

"আর কাকে ডাকব এদিকে শুনেন।"

আমি কাছে এগিয়ে এলাম। পুলিশটা কয়েকবার আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল, দেখে বলল, "আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি আপনি কেমন সন্দেহজনকভাবে থানার সামনে হাঁটাহাঁটি করছেন। ব্যাপারটা কী ?"

"না মানে ইয়ে ইয়ে—" আমার গলা শুকিয়ে গেল, হাত ঘামতে লাগল বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

পুলিশটা আবার ধমক দিয়ে উঠল, "কী হলো, প্রশ্নের উত্তর দেন না কেন ?"

আমি ঢোক গিলে বললাম, "আমি ইডি না বিডি কী যেন বলে সেটা করাতে এসেছি।"

"ইডি ? বিডি ? সেটা আবার কী ?"

পুলিশের হম্বিতম্বি শুনে আমাদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছে, তার ভেতর থেকে একজন বলল, "জিডি হবে মনে হয়।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ জিডি। জিডি করাতে এসেছি।"

পুলিশটা চোখ পাকিয়ে বলল, "জিডিকে আপনি ইডি বিডি বলছেন কেন ? পুলিশকে নিয়ে টিটকারি মারেন ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না-না, আমি মোটেও টিটকারি মারতে চাই নাই। শব্দটা ভুলে গিয়েছিলাম।"

"একটা জিনিস যদি ভুলে যান, তাহলে সেটা করাবেন কেমন করে ?"

প্রশ্নটার কী উত্তর দিব বুঝতে পারছিলাম না। বলে চুপ করে থাকলাম। পুলিশটা ধমক দিয়ে বলল, "আর জিডি করাতে হলে বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন কেন ? ভেতরে যান।"

কাজেই সুব্রতকে ছাড়াই আমাকে ভেতরে ঢুকতে হলো, কিছুক্ষণের মাঝেই আমাকে আমার থেকেও মোটা একজন পুলিশ অফিসারের সামনে নিয়ে গেল। সে একটা ম্যাচকাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "কী ব্যাপার ?"

আমি বললাম, "ইয়ে, একটা জিডি করাতে এসেছি ?"

"কী নিয়ে জিডি ?"

"একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেছে না হারিয়ে গেছে ?"

"পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেলে আবার জিডি করাতে হয় নাকি ? বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেন বাড়ি কোথায়, সেখানে নিয়ে যান। সব কাজ কি পুলিশ করবে নাকি ? পাবলিকের একটা দায়িত্ব আছে না ? কয়দিন পরে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হলেও আপনারা জিডি করাতে চলে আসবেন। আপনি জানেন জিডি করাতে কত সময় লাগে ? কত ঝামেলা হয় ? আপনাদের কোন কাজকর্ম নাই ?"

পুলিশ অফিসার টানা কথা বলে যেতে লাগল। শেষপর্যন্ত যখন থামল তখন বললাম, "বাচ্চাটা খুব ছোট।"

"কত ছোট ?"

আমি হাত দিয়ে বাচ্চাটার সাইজ দেখালাম, পুলিশ অফিসার চোখ কপালে তুলে বলল, "কিসের বাচ্চা ? মানুষের না ইন্দুরের ?"

"জি মানুষের।"

"মানুষের বাচ্চা এত ছোট হয় কেমন করে ? আর এত ছোট বাচ্চা এসেছে কেমন করে ?"

"সেটা তো জানি না। কেউ একজন রেখে গেছে মনে হয়।"

"কেন রেখে গেছে ?"

"সেটা তো জানি না।"

"কখন রেখে গেছে ?"

"সেটাও তো জানি না।"

"বাচ্চা ছেলে না মেয়ে ?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সেটাও তো জানি না।"

পুলিশ অফিসার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "আপনি যদি কিছুই না জানেন, তাহলে এখানে এসেছেন কেন ? আমি কি আপনার সম্বুন্ধী নাকি দুলাভাই যে আমার সাথে মশকরা করতে আসবেন ? বাসাটা কোথায় ?"

আমি অনিকের বাসার নম্বরটা জানতাম, কিন্তু পুলিশের ধমক খেয়ে সেটাও ভুলে গেলাম, মাথা চুলকে বললাম, "ইয়ে, মানে ইয়ে—"

পুলিশ অফিসার একটা বাজখাঁই ধমক দিয়ে বলল, "আপনারা কি ভাবেন আমাদের কোন কাজকর্ম নাই ? আপনাদের সাথে খোশগল্প করার জন্যে বসে আছি ? আপনাদের কোন কাজকর্ম না থাকলে এইখানে চলে আসবেন, কোন একটা বিষয়ে জিডি করার জন্যে ? শহরে মশা থাকলে জিডি করাবেন ? আকাশে মেঘ থাকলে জিডি করাবেন ? বউ ধমক দিলে জিডি করাবেন ?"

কিছু একটা বলতে হয়, তাই মিনমিন করে বললাম, "ইয়ে বিয়ে করিনি এখনো, বউ ধমক দেবার চান্স নাই—"

"এত বয়স হয়েছে এখনো বিয়ে করেন নাই ?" পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে বলল, "কী করেন আপনি ?"

"ইয়ে সেরকম কিছু করি না।"

"তাহলে আপনার সংসার চলে কেমন করে ?"

আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। আমতা আমতা করে বললাম, "আসলে সেরকম সংসারও নাই—"

পাশের টেবিলে একজন মহিলা পুলিশ বসে ছিল। সে বলল, "স্যার ভেরি সাসপিশাস কেস। দেখেও সেরকম মনে হয়। চুয়ান্ন ধারায় এরেস্ট দেখিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দেন—"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "কী বলছেন আপনি ?"

মহিলা পুলিশ বলল, "ঠিকই বলেছি। আমরা এই লাইনে কাজ করি। একজন মানুষকে দেখলেই বুঝতে পারি সে কী জিনিস!"

পুলিশ অফিসার নতুন একটা ম্যাচকাঠি বের করে আবার দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "ঠিকই বলেছ। চুয়ান্ন ধারায় চালান করে দেই। জন্মের মতো শিক্ষা হয়ে যাবে।"

একজন মানুষকে যে চাউলের বস্তার মতো চালান করা যায় আমি জানতাম না, কিন্তু কিছু বোঝার আগেই দেখলাম আমি সত্যি সত্যি হাজতের মাঝে চালান হয়ে গেছি। ঘরঘর করে লোহার গেটটা টেনে বিশাল একটা তালা ঝুলিয়ে যখন আমাকে হাজতে আটকে ফেলল, আমার মাথায় তখন রীতিমতো আকাশ ভেঙে পড়ল।

হাজতের ভেতরে যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রথমে লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধটা কোথা থেকে আসছে সেটাও দেখা যাচ্ছে, ভয়ের চোটে আমার বাথরুম পেয়ে গেছে কিন্তু হাজতের ভেতরে এই দরজাবিহীন বাথরুম দেখে সেই বাথরুমের ইচ্ছাও উঠে গেল। ভেতরে গোটা দশেক মানুষ শুয়ে-বসে আছে। দুই-চারজনকে একটু চিন্তিত মনে হলো, তবে বেশিরভাগই নির্বিকার। একজন ম্যাচের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আছে ?"

কিসের কথা জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পারলাম না, বললাম, "কী আছে ?"

"সেইটাও যদি বলে দিতে হয় তাহলে হাজতে আমি আর আপনি কথা বলছি কেন ?"

আমি বললাম, "আমি মানে আসলে—"

আরেকজন বলল, "বাদ দে। চেহারা দেখছিস না লেন্দু টাইপের।"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "কিসের কেইস আপনার ?"

আমি বললাম, "কোন কেইস নাই। ভুল করে—"

কথা শেষ হবার আগেই হাজতে বসে থাকা সবাই হা হা করে হেসে উঠল যেন আমি খুব মজার একটা কথা বলেছি। একজন হাসি থামিয়ে বলল, "আমাদের সামনে গোপন করার দরকার নাই। বলতে পারেন, কোন ভয় নাই—"

আমি বললাম, "না, না, আপনারা যা ভাবছেন মোটেও তা না। একটা ছোট বাচ্চা—"

কথা শেষ করার আগেই একজন বলল, "ও! ছেলেধরা।"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম তখন আরেকজন বলল, "লজ্জা করে না ছেলেধরার কাম করতে ? বুকে সাহাস থাকলে ডাকাতি করবেন। সাহস না থাকলে চুরি করবেন। তাই বলে ছেলে ধরা ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

ষণ্ডাগোছের একজন বলল, "বানাবু নাকি ?"

মাঝ বয়সের একজন বলল, "এখন না। অন্ধকার হোক।"

ষণ্ডাগোছের মানুষটা বিরস মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কখন অন্ধকার হবে আর কখন আমাকে বানাবে সে জন্যে অপেক্ষা করার তার ধৈর্য নাই। আমার মনে হলো আমি ডাক ছেড়ে কাঁদি।

আমার অবশ্যি ডাক ছেড়ে কাঁদতে হলো না, ঘণ্টা খানেকের মাঝে সুব্রত এসে আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। যে পুলিশ অফিসার আমাকে চালান দিয়েছিল সে-ই তালা খুলে আমাকে বের করে আনল। সুব্রত তার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "থ্যাংক ইউ গনি সাহেব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।"

গনি সাহেব বললেন, "আমাকে থ্যাংকস দেয়ার কিছু নাই। আইনের মানুষ, আইন যেটা বলে আমরা সেটাই করি। তার বাইরে যাবার আমাদের কোন ক্ষমতা নাই।"

থানা থেকে বের হয়েই সুব্রত আমাকে গালাগাল শুরু করল। বলল "তোর মতো গাধা আমি জন্মে দেখি নাই। জিডি করতে এসে নিজে এরেস্ট হয়ে গেলি ? আমার যদি আসতে আরেকটু দেরি হতো, তাহলে কী হতো ? যদি জেলখানায় চালান করে দিত ?"

আমি বললাম, "তুই দেরি করে এলি কেন ? তোর জন্যেই তো আমার এই বিপদ।"

"আমি রওনা দিয়ে ভাবলাম ছোট বাচ্চাদের একটা হোম থেকে খোঁজ নিয়ে যাই। তোর বন্ধু পুরুষ, ছোট বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারবে না। এর জন্যে দরকার একটা হোম। একটা অনাথাশ্রম।"

"আছে এরকম জায়গা ?"

"থাকবে না কেন ? এই যে ঠিকানা নিয়ে আসেছি। কথাও বলে এসেছি।" সুব্রত আমাকে একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বলল, যে মহিলা দায়িত্বে আছেন তার নাম দুর্দানা বেগম।

"দুর্দানা বেগম ? এটা কী রকম নাম ?"

সুব্রত বিরক্ত হয়ে বললম, "আমি কি নাম রেখেছি নাকি ? আমাকে দোষ দিচ্ছিস কেন ?"

"দোষ দিচ্ছি না। জানতে চাচ্ছি।"

সুব্রত মুচকি হেসে বলল, "তবে নামটা দুর্দানা বেগম না হয়ে দুর্দান্ত বেগম হলে মনে হয় আরও ভাল হতো।"

"কেন ?"

"আসলেই দুর্দান্ত মহিলা। অনাথাশ্রমটাকে চালায় একেবারে মিলিটারির মতো। পান থেকে চুন খসার উপায় নাই। কী ডিসিপ্লিন— দেখলে অবাক হয়ে যাবি।"

আমি ভীতু মানুষ, নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বেশ ভয় পাই, তাই দুর্দানা বেগম আর তার অনাথ শ্রমের কথা শুনে একটু ভয়ই পেলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বাচ্চাদের মারধর করে নাকি ?"

"আরে না। দুর্দানা বেগমের গলাই যথেষ্ট, মারধর করতে হয় না।"

সুব্রত তার ঘড়ি দেখে বলল, "তুই এখন কোথায় যাবি ?"

"অনিক লুম্বার বাসায়। তুইও আয়, বাচ্চাটাকে দেখে যা।"

"নাহ। এখন সময় নাই। ঢাকা শহর নর্দমা পুনরুজ্জীবন কমিটির মিটিং আছে।"

"নর্দমা পুনরুজ্জীবনেরও কমিটি আছে ?"

"না থাকলে হবে ? ঢাকা শহর পানিতে তাহলে তলিয়ে যাবে।" সুব্রত আমার দিকে হাত নেড়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে গেল। বাস থেকে মাথা বের করে বলল, "আজকেই দুর্দানা বেগমের সাথে যোগাযোগ করবি কিন্তু।"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "করব।"

আমি অবশ্যি দুর্দানা বেগমের সাথে যোগাযোগ না করে অনিকের বাসায় ফিরে গেলাম। এখনো অনিকের গেট খোলা এবং দরজা খোলা। ঢুকে দেখি ভেতরে ল্যাবরেটরি ঘরে একটা বড় টেবিলে একটা বিশাল একুরিয়ামের মাঝে অনিক পানি ভরছে। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কী করছ ?"

"একুরিয়ামে পানি ভরছি।"

"সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জানতে চাইছি কেন এরকম সময়ে ল্যাবরেটরি ঘরের মাঝখানে একটা একুরিয়াম, আর কেন এরকম সময়ে এখানে পানি ভরছ ?"

অনিক আমার কথার উত্তর না দিয়ে হাসি হাসি মুখে তাকাল। আমি বললাম, "বাচ্চাটা কোথায় ?"

"ঘুমাচ্ছে। একটা ছোট বাচ্চা বেশির ভাগ সময় ঘুমায়। পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য।"

"কোথায় ঘুমাচ্ছে ?"

"এই যে। আলমারিতে।"

আমি অবাক হয়ে দেখলাম আলমারির একটা তাক খালি করে সেখানে কয়েকটা টাওয়েল বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে এই টুকুন একটা

বাচ্চা তার পিছনটুকু ওপরে তুলে মহাআরামে ঘুমাচ্ছে। এরকমভাবে একটা বাচ্চা ঘুমাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

অনিক বলল, "ছোট বাচ্চাদের তিনটা কাজ— খাওয়া, ঘুম এবং বাথরুম। সে তিনটাই করে ফেলেছে। বাচ্চাটা অত্যন্ত লক্ষ্মী।" অনিক হঠাৎ করে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলে?"

আমি রাগ হয়ে বললাম, "আমার কী হলো না হলো সেটা নিয়ে তোমার খুব মাথাব্যথা আছে বলে তো মনে হলো না।"

অনিক একটু অবাক হয়ে বলল, "তোমার কিছু হয়েছে নাকি?"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "হয়নি আবার? হাজত খেটে এসেছি।"

অনিক মুখ হাঁ করে বলল, "হাজত খেটে এসেছ। কেন?"

আমি রাগে গরগর করে বললাম, "তোমার লক্ষ্মী বাচ্চার জন্যে।"

"লক্ষ্মী বাচ্চার জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কারণ আমি জানি না তোমার লক্ষ্মী বাচ্চা কেমন করে এখানে এসেছে, কেন এসেছে এবং কখন এসেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি জানি না তোমার লক্ষ্মী বাচ্চাটি ছেলে না মেয়ে।"

"সে কী! তুমি জানো না?"

"না।"

কী আশ্চর্য! অনিক একুয়ারিয়ামে পানিভর্তি বন্ধ করে আমার কাছে এসে আমায় হাত ধরে টেনে আলমারির কাছে নিয়ে গেল। বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল, "এর মুখের দিকে তাকাও! দেখছ না এটি একটি মেয়ে। কী সুইট চেহারা দেখছ না? একটা মেয়ে না হলে কখনো চেহারা এরকম সুইট হতে পারে?"

ঘুমের ভেতরে বাচ্চারা হাসাহাসি করে আমি জানতাম না, অবাক হয়ে দেখলাম ঠিক এরকম সময়ে বাচ্চাটি তার মাড়ি বের করে একটু হেসে দিল। তখন আমারো কোন সন্দেহ থাকল না যে এটি নিশ্চয়ই একটা মেয়ে। বললাম, "ঠিকই বলেছ। নিশ্চয়ই মেয়ে। তবে—"

"তবে কী?"

"কাপড় খুলে একবার দেখে নিলে হয়।"

অনিক বলল, "হ্যাঁ। সেটাও দেখেছি।"

"গুড। এসব ব্যাপারে শুধু চেহারার ওপরে ভরসা না করে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল।"

অনিক আবার তার একুরিয়ামের কাছে গিয়ে পানি ভরতে ভরতে বলল, "সকালবেলা উঠেই তোমার এত ঝামেলা! আমার খুব খারাপ লাগছে শুনে।"

"এখন খারাপ লেগে কী হবে! তবে আমার একটা অভিজ্ঞতা হলো!"

"সেভাবেই দেখো। নতুন অভিজ্ঞতা। জীবনে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে বড় কথা।"

আমি আলোচনাটা অভিজ্ঞতা থেকে একুরিয়ামে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "এখন বলো এত বড় একুরিয়ামে পানি ভরছ কেন?"

অনিক একটু ইতস্তত করে বলল, "একটা পরীক্ষা করার জন্যে।"

"কী পরীক্ষা করবে?"

"ছোট বাচ্চারা না কি জন্মাবার পর সাঁতার কাটতে পারে।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, অবাক হয়ে বললাম, "সাঁতার কাটতে পারে?"

"হ্যাঁ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ছোট বাচ্চাদের জন্মের পর পর পানিতে ছেড়ে দিলে তারা সাঁতার কাটতে পারে।"

এবারে পানির একুরিয়ামের রহস্য খানিকটা পরিষ্কার হলো। আমি বললাম, "তুমি এই বাচ্চাটাকে পানির মাঝে ছেড়ে দিতে চাও?"

অনিক মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই এটা সত্যি কিনা।"

আমি মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ অনিকের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, "তুমি বলতে চাও যে এই ছোট বাচ্চাটাকে এই পানির মাঝে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে সে সাঁতার কাটতে পারে কিনা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।"

"না, না তুমি যা ভাবছ—"

আমি অনিককে বাধা দিয়ে বললাম, "তুমি যদি ভাবো একটা গেদা বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দিয়ে তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে। আর আমি বসে বসে সেটা দেখব, তাহলে জেনে রাখো তুমি মানুষ চিনতে ভুল করেছ।"

অনিক বলল, "আরে আগে তুমি আমার কথা শোনো।"

"তোমার কোন কথা আমি শুনব না। তুমি যদি এই মুহূর্তে এই ছোট বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা বন্ধ না করো তাহলে প্রথমে আমি গনি সাহেবকে তারপর দুর্দানা বেগমকে ফোন করব।"

অনিক বলল, "এরা কারা?"

"গনি সাহেব হচ্ছে আমার থেকেও মোটা একজন পুলিশ অফিসার। আমি তার কাছে জিডি করাতে গিয়েছিলাম, বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে বলতে পারি নাই বলে আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।"

"আর দুর্দানা বেগম ?"

"দুর্দানা বেগমের ভাল নাম হওয়া উচিত দুর্দান্ত বেগম। কারণ এই মহিলার হুঙ্কার শুনলে ছোট বাচ্চাদের কাপড়ে পিশাব হয়ে যায়। সে ছোট ছোট বাচ্চাদের একটা হোম চালায়। তাকে খবর দিলে সে এসে তোমার গলা টিপে ধরবে।"

অনিক বলল, "তুমি বেশি উত্তেজিত হয়ে গেছ। একটু শান্ত হও।"

আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "আমি মোটেই উত্তেজিত হই নাই—"

আমার হুঙ্কার শুনে বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠে ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অনিক বলল, "দিলে তো চিৎকার করে বাচ্চাটাকে তুলে—"

অনিক ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "একটা ছোট বাচ্চা ঘরে থাকলে এরকম ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে হয় না।"

অনেক কষ্টে গলা না তুলে শান্ত গলায় বললাম, "আমি ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে চাই না। কিন্তু যেসব কাজকর্ম করতে চাইছ সেটা শুনলে যে কোন মানুষ ষাঁড়ের মতো চিৎকার করবে।"

বাচ্চাটা একটু শান্ত হয়েছে। অনিক আবার তাকে আলমারিতে বন্ধ করে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি কি ভাবছ আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে কোন রকম বিপদের কাজ করব ?"

"একটা বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দেয়ার থেকে বড় বিপদের কাজ কী হতে পারে ?"

"তুমি শান্ত হও। আমার কথা আগে শোনো। একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন সে কোথায় থাকে ?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "এটা আবার কী রকম প্রশ্ন ? মায়ের পেটে যখন থাকে তখন তো মায়ের পেটেই থাকে।"

"আমি সেটা বলছি না— আমি বলছি মায়ের পেটের ভেতরে কোথায় থাকে ? একটা তরল পদার্থের ভেতর। সেখানে তার নিঃশ্বাস নিতে হয় না কারণ অ্যামবিলিকেল কর্ড দিয়ে মায়ের শরীর থেকে অক্সিজেন পায়, পুষ্টি পায়।"

অনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে পারলে থামতে চায় না, তাই হাত নেড়ে বলতে লাগল, "জন্ম হবার পর ফুসফুস দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়। অ্যামবিলিকের কর্ড কেটে দেয়া হয় বলে মুখ দিয়ে খেতে হয়। মায়ের পেটের ভেতরে তরল পদার্থে তারা খুব আরামে থাকে, তাই জন্মের পরও তাদেরকে পানিতে ছেড়ে দিলে তারা মনে করবে মায়ের পেটের ভেতরেই আরামে আছে—"

আমি আপত্তি করে বললাম, "ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।"

"তাহলে কোথায় ছাড়বে ?"

অনিক বলল, "আমি কি ঠাণ্ডা পানিতে ছাড়ব নাকি ?"

"পানির তাপমাত্রা থাকবে ঠিক মায়ের শরীরের তাপমাত্রা। কুসুম কুসুম গরম—"

"আর নিঃশ্বাস ?"

"মুখে লাগানো থাকবে মাস্ক। সেখানে থাকবে অক্সিজেন টিউব।"

"কান দিয়ে যদি পানি ঢুকে ?"

"কানে থাকবে এয়ার প্লাগ।"

"কিন্তু তাই বলে একটা ছোট বাচ্চাকে পানিতে ছেড়ে দেয়া—"

অনিক বলল, "আমি কি বাচ্চাকে ঝপাং করে পানিতে ফেলে দেব ? আস্তে করে নামাব। যদি দেখি বাচ্চাটা পছন্দ করছে আস্তে আস্তে প্রথমে পা তারপর শরীর তারপর মাথা—"

"কিন্তু—"

"এর মাঝে কোন কিন্তু নেই। এই এক্সপেরিমেন্ট আমাকে আর কে করতে দেবে ? তুমি দেখো এর মাঝে বাচ্চাটাকে একবারও আমি বিপদের মাঝে ফেলব না।"

অনিকের ওপর আমার সেটুকু বিশ্বাস আছে, তাই আমি শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম।

অনিক একুয়ারিয়ামটা পানিতে ভর্তি করে সেটার মাঝে একটু গরম পানি মিশিয়ে পানিটাকে আরামদায়ক কুসুম কুসুম গরম করে নিল। পানিতে একটা ছোট হিটার আরেকটা থার্মোমিটার বসাল। থার্মোমিটারের সাথে অনেক জটিল যন্ত্রপাতি। তাপমাত্রা কমতেই নাকি নিজে থেকে হিটার চালু হয়ে আবার আগের তাপমাত্রায় নিয়ে যাবে। একুরিয়ামের পাশে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার। তার পাশে একটা নাইট্রোজেনের সিলিন্ডার। দুটো গ্যাস মাপমতো মিশিয়ে সেখান থেকে একটা প্লাস্টিকের টিউবে করে একটা ছোট মাস্কে লাগিয়ে নিল। এই ছোট মাস্কটা বাচ্চার মুখে লাগাবে।

সব কিছু ঠিকঠাক করে অনিক বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে। তার মুখে মাস্কটা লাগানোর সময় সে কয়েকবার ট্যাঁ ট্যাঁ করে আপত্তি করল কিন্তু শেষপর্যন্ত মেনে নিল। যখন দেখা গেল সে বেশ আরামেই নিঃশ্বাস নিচ্ছে তখন অনিক সাবধানে বাচ্চাটার জামা-কাপড় খুলে একুরিয়ামের পানিতে নামাতে থাকে। আমি পাশেই একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি বাচ্চাটা পানি পছন্দ না করে তাহলে অনিক তুলে আনবে, আমি শরীর মুছে দেব।

কিন্তু পা-টা পানিতে ডোবানো মাত্রই বাচ্চাটার চোখ খুলে গেল এবং আনন্দে হাত-পা নাড়তে লাগল। অনিক খুব ধীরে ধীরে বাচ্চাটাকে নামাতে

থাকে, কুসুম কুসুম গরম পানি, বাচ্চাটার নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হচ্ছে, সে হাত-পা নাড়তে নাড়তে স্ফূর্তি করতে শুরু করে দিল। অনিক আরও সাবধানে নামিয়ে প্রায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল, তখন বাচ্চাটা একেবারে পাকা সাঁতারুর মতো সাঁতার কাটতে শুরু করে দিল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম অনিকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে একুরিয়ামের ভেতর সাঁতার কাটছে। হঠাৎ করে মাথা পানির ভেতরে ডুবিয়ে পানির নিচে চলে গেল, আমি ভয়ে একটা চিৎকার করে উঠছিলাম কিন্তু দেখলাম ভয়ের কিছু নেই। বাচ্চাটা নির্বিঘ্নে মাঝে দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে পানিতে ওলটপালট খেয়ে সাঁতার কাটছে। এরকম আশ্চর্য একটা দৃশ্য যে হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

অনিক আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ ? দেখেছ তুমি ?"

"হ্যাঁ।"

"ছোট বাচ্চা পানিতে কত সহজে সাঁতার কাটে দেখেছ ?"

সত্যিই তাই। এই টুকুন ছোট বাচ্চা পানির নিচে ঠিক মাছের মতো সাঁতার কাটতে লাগল। দুই হাত দুই পা নেড়ে একুরিয়ামের একপাশ থেকে অন্যপাশে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ ওপরে উঠে আসছে, হঠাৎ ডিগবাজি দিয়ে নিচে নেমে আসছে! একেবারে অবিশ্বাস্য দৃশ্য। অনিক বলল, "এক্সপেরিমেন্ট কমপ্লিট। এবারে তুলে নেয়া যাক, কী বলো ?"

আমি বললাম, "আহা হা! বাচ্চাটা এত মজা করছে, আরও কিছুক্ষণ থাকুক না।"

অনিক বলল, "ঠিক আছে তাহলে থাকুক।"

ঠিক এই সময় দরজায় শব্দ হলো। আমি চমকে উঠে বললাম, "কে ?"

অনিক বলল, "খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে। তুমি দরজা খুলে কাগজটা রেখে দাও দেখি— আমি বাচ্চাটাকে দেখছি।"

আমি বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, পাহাড়ের মতন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা বাঘের মতন। চোখ দুটো জ্বলছে, চুল পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। আমাকে কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু দেখেই আমি বুঝতে পারলাম, এই মহিলা নিশ্চয়ই দুর্দানা বেগম। মহিলাটি বাঘিনীর মতো গর্জন করে বলল, "এই বাসায় একটা ছোট বাচ্চা পাওয়া গেছে ?"

আমি মিনমিন করে বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি বাচ্চাটাকে দেখতে এসেছি।"

আমি বললাম, "বা-বা-বাচ্চাটাকে দেখতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ।" মহিলা গর্জন করে বলল, "আমার নাম দুর্দানা বেগম। আমি ছোট বাচ্চাদের একটা হোম চালাই।"

"ও আচ্ছা।" আমি বললাম, "ভেরি গুড ভেরি গুড—"

মহিলা আবার গর্জন করল, "বাচ্চা কোথায় ?"

"আছে ভেতরে।"

"দেখান আমাকে।"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "বাচ্চার কী দেখতে চান ?"

"বাচ্চাকে কীভাবে রাখা হয়েছে, কী খাচ্ছে, কীভাবে ঘুমাচ্ছে— এইসব বাচ্চার বিপদের ঝুঁকি আছে কিনা, অযত্ন হচ্ছে কিনা— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা—"

দুর্দানা বেগমের লিস্ট অনেক বড়, মাত্র বলতে শুরু করেছিল কিন্তু হঠাৎ করে থেমে গেল, কারণ ঠিক তখন বাসার সামনে একটা পুলিশের গাড়ি থেমেছে, আর সেই গাড়ি থেকে বিশাল একজন পুলিশ অফিসার নেমে এলো, একটু কাছে এলেই আমি চিনতে পারলাম, গনি সাহেব, আজ সকালে এই মানুষ আমাকে হাজতে পুরে রেখেছিল।

দরজার সামনে আমাকে দেখে গনি সাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল, ক্ষুধার্ত বাঘ যখন একটা নাদুসনুদুস হরিণ দেখে তার মুখে মনে হয় ঠিক এইরকম হাসি ফুটে ওঠে। গনি সাহেব তার দাঁতগুলি বের করে বলল, "আপনি এখনো আছেন ?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "জি আছি।"

"নিজের চোখে দেখতে এলাম।"

"কী দেখতে এসেছেন ?"

"বাচ্চাটা আসলেই আছে কিনা। থাকলেও কেমন আছে— আজকাল কোন কিছুর ঠিক নাই। হয়তো ছোট বাচ্চার ওপর অত্যাচার।"

দুর্দানা বেগমের পুলিশের কথাটা খুব মনে ধরল। বলল, "ঠিক বলেছেন। ছোট বাচ্চাও যে একজন মানুষ সেটা অনেকের খেয়াল থাকে না। এক বাসায় গিয়ে দেখি বাচ্চাকে ভেজা কাঁথার মাঝে শুইয়ে রেখেছে।"

গনি সাহেব বলল, "ভেজা কাঁথা কী বলছেন ? আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, এই ঢাকা শহরে এমন ঘাঘু ক্রিমিন্যাল আছে যে পারলে বাচ্চাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখবে।"

দুর্দানা বেগম চোখ গোল গোল করে বলল, "বলেন কী আপনি ?"

গনি সাহেব নাক দিয়ে শব্দ করে বলল, "আমি এই লাইনের মানুষ, চোর-ডাকাত-গুণ্ডা নিয়ে আমার কারবার। দুনিয়ায় যে কত কিসিমের মানুষ আছে আপনি জানেন না। আমি জানি।"

গনি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বাসা কার ?"

আমি মিনমিন করে বললাম, "আমার বন্ধুর।"

"তাকে ডাকেন।"

আমি কিছু বলার আগেই দুইজনে প্রায় ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকে গেল। আমি তাদেরকে বসিয়ে প্রায় দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। বাচ্চাটা তখনো একুরিয়ামে মহাআনন্দে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, অনিক চোখ-মুখে একটা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বাচ্চাটাকে দেখছে। আমাকে দেখে বলল, "কী হলো, পেপারটা আনতে এতক্ষণ ?"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "পেপার না।"

"তাহলে কে ?"

"দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব। বাচ্চা দেখতে এসেছে। এক্ষুণি বাচ্চাকে পানি থেকে তুলো। এক্ষুণি।"

বাইরের ঘর থেকে দুর্দানা বেগম আবার বাঘিনীর মতো গর্জন করল, "কোথায় বাড়ির মালিক ?"

অনিক ফিসফিস করে বলল, "আমি ওদেরকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখছি। তুমি বাচ্চাটাকে তুলো। মাস্ক খুলে একটা টাওয়েলে জড়িয়ে নিয়ে আসো।"

"আ-আ-আমি ?"

"তুমি নয় তো কে ?"

বাইরের ঘর থেকে আবার হুঙ্কার শোনা গেল, "কোথায় গেল সবাই ?"

অনিক তাড়াতাড়ি উঠে গেল। আমি তখন বাচ্চাটাকে পানি থেকে তোলার চেষ্টা করলাম। এত ছোট একটা বাচ্চাকে যখন শুকনো জায়গায় রাখা হয় তখন সে নড়তে চড়তে পারে না, এক জায়গায় শুয়ে থাকে। কিন্তু পানিতে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার একটা ছোট বাচ্চা সেখানে তুখোড় সাঁতারু। আমি তাকে চেষ্টা করেও ধরতে পারি না। একবার খপ করে তার পা ধরলাম সে পিছলে বের হয়ে গেল। আরেকবার তার হাত ধরতেই ডিগবাজি দিয়ে সরে গেল। শুধু যে সরে গেল তা না, মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে জিব বের করে একটা ভেংচি দিল। এবার দুই হাত ঢুকিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করলাম, তারপরেও কেমন করে যেন পিছলে বের হয়ে গেল। অনিক কতক্ষণ দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেবকে আটকে রাখতে পারবে কে জানে, আমি এবার তাকে ভালভাবে ধরার চেষ্টা করলাম আর তখন ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটল। বাচ্চাটার নিঃশ্বাস নেবার টিউবটা আমার হাতে পেঁচিয়ে গেল, বাচ্চাটা আমার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে একটা ডিগবাজি দিতেই তার মুখ থেকে মাস্কটা খুলে যায়। মাস্কটার ভেতর থেকে অক্সিজেনের বুদবুদ বের হতে থাকে আর সেটা ধীরে ধীরে পানিতে ভেসে উঠতে থাকে।

আমি অনেক কষ্ট করে চিৎকারটা চেপে রাখলাম— বিস্ফারিত চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছি, দেখছি ধীরে ধীরে বাচ্চাটা পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে ধরার চেষ্টা করছি, আর কী আশ্চর্য সেই অবস্থায় আমার হাত থেকে সে পিছলে বের হয়ে গেল! বাচ্চাটার নিঃশ্বাস নেবার জন্যে অক্সিজেন নেই কিন্তু সেটা নিয়ে তার কোন সমস্যা নেই। একুরিয়ামের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় মাছের মতো সাঁতরে যেতে যেতে দুটো ডিগবাজি দিল। তারপর হাত-পা নাচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে জিব বের করে আমাকে ভেংচে দিল। কিন্তু নিঃশ্বাস নেবে কীভাবে ? আমি আবার হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম, বাচ্চাটা আমার হাত থেকে পিছলে বের করে মাথাটা পানির ওপরে এনে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পানির নিচে ডুবে গেল। এই বাচ্চার মতো চালু বাচ্চা আমি আমার জন্মে কখনো দেখিনি। আগে মুখে একটা মাস্ক লাগানো ছিল, সেখান থেকে অক্সিজেনের নল বের হয়েছিল, এত কিছু ঝামেলা নিয়ে সাঁতার দিতে তার রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছিল। এখন তার শরীরের সাথে কিছু লাগানো নাই, সাঁতার দিতেও ভারি সুবিধে। তাকে ধরবে এরকম সাধ্যি কার আছে ? পানির ভেতরে ডিগবাজি দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছে, আর যখন নিঃশ্বাস নেবার দরকার হয় তখন ভুস করে মাথা বের করে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পানিতে ঢুকে যাচ্ছে। আমি বিস্ফারিত চোখে এই বিস্ময়কর দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। পুরো ব্যাপারটি তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হঠাৎ করে আমার মাথা ঘুরে উঠল, আমি পড়েই যাচ্ছিলাম, কোন মতে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বসে পড়ার চেষ্টা করলাম। বড় একটা আলমারি ধরে তার পাশে বসে পড়লাম, মনে হচ্ছে এখনি অজ্ঞান হয়ে যাব।

ঠিক এই সময় ঘরটাতে দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব এসে ঢুকল। আলমারির আড়ালে ছিলাম বলে তারা আমাকে দেখতে পেল না কিন্তু আমি তাদের দেখতে পেলাম। তারা পুরো ঘরটিতে চোখ বুলিয়ে একুরিয়ামের দিকে তাকাল, বাচ্চাটা সাঁতরে উপরে উঠে ভুস করে মাথা বের করে আবার নিচে নেমে এলো। আমি নিশ্চিত ছিলাম দুর্দানা বেগম এখন গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দেবে কিন্তু সে চিৎকার দিল না। দুজনেই একুরিয়াম থেকে তাদের চোখ সরিয়ে ল্যাবরেটরির অন্য কোণায় নিয়ে গেল। তারা নিজের চোখে দেখেও বিষয়টা বুঝতে পারছে না, ধরেই নিয়েছে একুরিয়ামে একটা মাছ সাঁতার কাটছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার!

দুর্দানা বেগম বলল, "আপনার বাসায় একটা বাচ্চা অথচ আপনার ঘর-বাড়ি এত নোংরা ?"

শুধুমাত্র অনিক পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারছে, সে নিশ্চয়ই নিজের চোখকে বিশ্বাস করছে না। উত্তরে কোন একটা কথা বলার চেষ্টা করে বলল, "ক-ক-করব। প-প-পরিষ্কার করব।"

গনি সাহেব নাক দিয়ে ফোঁৎ করে শব্দ করে বলল, "আপনার মোটা বন্ধুটা বাচ্চাটাকে নিয়ে আসছে না কেন?"

অনিক বলল, "আ-আ-আনবে। আপনারা বাইরের ঘরে বসেন। এ-এ এক্ষুণি নিয়ে আসবে।"

দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব ঘর থেকে বের হতেই আমি কোনমতে উঠে আবার একুরিয়ামে হাত ঢুকিয়ে ফিসফিস করে বাচ্চাটাকে উদ্দেশ করে বললাম, "দোহাই লাগে তোমার সোনামণি। আল্লাহর কসম লাগে তোমার, কাছে আসো! প্লি-ই-জ!"

এত চেষ্টা করে যে বাচ্চাটাকে ধরতে পারিনি সেই বাচ্চা হঠাৎ সাঁতরে এসে দুই হাত দুই পা দিয়ে আমার হাতটাকে কোল বালিশের মতো ধরে ফেলল। আমি পানি থেকে বাচ্চা আঁকড়ে ধরে রাখা হাতটা বের করে, বাচ্চাটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। এর আগে কখনো ছোটো বাচ্চা ধরিনি, তাই খুব সাবধানে দুই হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এসে দাঁড়ালাম।

দুর্দানা বেগম ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চাকে গোসল করাতে গিয়ে দেখি নিজেই গোসল করে ফেলেছেন।"

গনি সাহেব বলল, "ছোট বাচ্চাকে পানির কাছে নেবার সময় খুব সাবধান।"

দুর্দানা বেগম বলল, "কিছুতেই যেন পানিতে পড়ে না যায়।"

আমি মাথা নাড়লাম, "পড়বে না। কখনো পড়বে না।"

দুর্দানা বেগম আর গনি সাহেব দুজনেই ভুরু কুঁচকে মুখ শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু যেই আমি তোয়ালেটা সরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখালাম দুজনের মুখই হঠাৎ করে নরম হয়ে গেল। দুজনেই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল, আর কী আশ্চর্য, বাচ্চাটা জিব বের করে দুজনকে ভেংচে দিল!

গনি সাহেব দুর্দানা বেগমের দিকে আর দুর্দানা বেগম গনি সাহেবের দিকে তাকাল তারপর দুজনেরই সে কী হাসি! মনে হয় সেই হাসিতে ঘরের ছাদ উড়ে যাবে।

এই পৃথিবীতে ছোট বাচ্চা থেকে সুন্দর কিছু কী আর আছে?

---

pathfinder